" হীরক রাজার দেশে " খ্যাত জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছবি

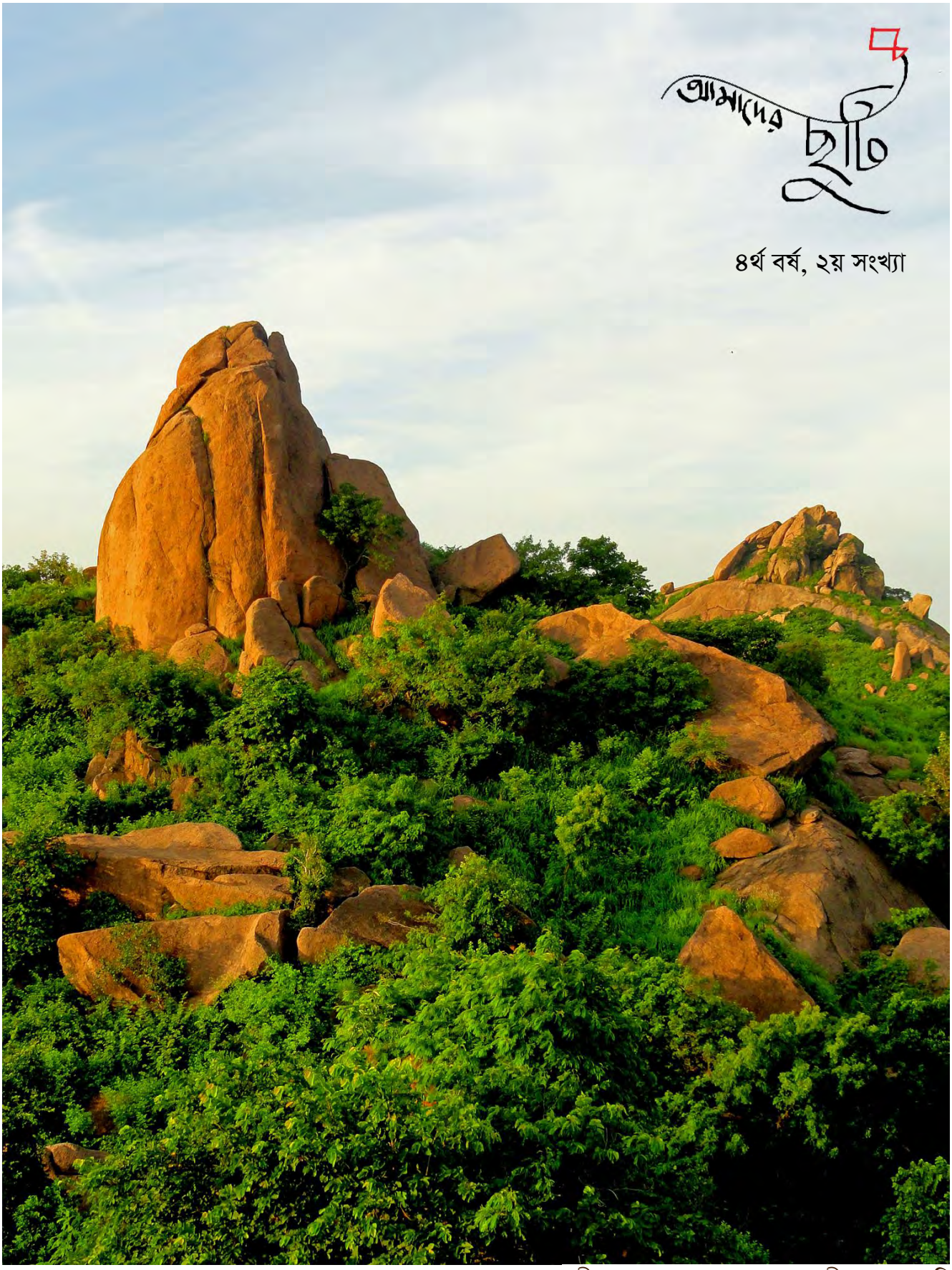

আলোকচিত্রী- শ্রীমতী অমৃতা ভট্টাচার্য্য

~ ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২১ ~

এবার না-ভ্রমণে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। সেই বোলপুর স্টেশন, রিকসাওয়ালাদের ডাকাডাকি, হিন্দি গানের সুর...। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে ... তবু কোথাও কোথাও তাকে দেখার ইচ্ছা করে বৈ কী...

সোনাঝুরির সাজিয়ে তোলা হাটে, হ্যান্ডিক্রাফটসের সারি সারি দোকানে, রিকসার অস্বাভাবিক চড়া ভাড়ায়, রবীন্দ্রভবনের মিউজিয়ামের লম্বা লাইনে, ছন্দহীন মফস্বলী পরিকাঠামোয় গড়ে ওঠা সারি সারি নানান লজ, ঝুপড়ি হোটেল অথবা গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে তৈরি হওয়া আধুনিক রিসর্টের অবয়বে কোথাও বিশু পাগল নেই।

তীব্র গরম। ফেরার পথে ট্রেনে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল।

- 'বল তো মা ছবি আঁকায় কোন রঙটা সবচেয়ে বেশি লাগে?'

- 'সবুজ'।

- 'না, নীল। ছোটরা তো প্রকৃতির ছবিই বেশি আঁকে, আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, নদী নীল। আমার তো রঙের বাক্সের সব নীল ফুরিয়ে যায়।'

- 'বাইরে দেখ, আকাশটা ধূসর, আর বাকী সব সবুজ সবুজ সবুজ... তাহলে?'

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বিশু পাগল আছে, গেছো দাদা আছে - প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে...

তাই হেরি তায় সকলখানে...।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"মুসলমানদের এলাহাবাদ অর্থাৎ আল্লার স্থান আর আমাদের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ,- এখানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া কত পাপী তাপী তরিয়া গেল, অধম আমার কিছু হইল না, আমি যে পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম - তাহা যেমন তেমনি রহিয়া গেল, এখানে আসিয়া অবধি আমার একদিন গঙ্গাস্নান হয় নাই।"

- "প্রয়াগ দর্শন" স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখনীতে

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র এবারে প্রথম পর্ব - "হেমকুণ্ডের পথে"

~ আরশিনগর ~

অরণ্যের রূপকথারা - কাঞ্চন সেনগুপ্ত

সান্দাকফুর টানে - শাশ্বতী ঘোষ

অযোধ্যাকাণ্ড - লোকেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী

~ সব পেয়েছির দেশ ~

হাম্পি - পাথর আর গ্রামের গল্প
- দোলা দত্ত রায়

স্বর্গ দর্শন - তুহিন ডি. খোকন

জারোয়াদের দেশে কয়েকদিন - স্তুতি বিশ্বাস

~ ভুবনডাঙা ~

কো-লার্ন দ্বীপে মধুচন্দ্রিমা – মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

~ শেষ পাতা ~

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলায় – ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বর্ষায় গড়পঞ্চকোটে – মানস ভট্টাচার্য

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

।ঠাকুরবাড়ির বিদূষী মহিলা, ঊনবিংশ শতকের অন্যতম মহিলা লেখক ও সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী (আনুমানিক ১৮৫৫-১৯৩২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা । শিক্ষালাভ অন্তঃপুরে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশির কাছে। বিবাহ ১৭ নভেম্বর ১৮৬৭ নদীয়ার জয়চন্দ্র ঘোষালের পুত্র জানকীনাথের সঙ্গে। সাহিত্য চর্চা শুরু অল্পবয়স থেকেই। গল্প, উপন্যাস, কবিতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন স্বর্ণকুমারী । বঙ্গাব্দ ১২৯১ থেকে ১৩০১ এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ অবধি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের থিয়সফিকাল সোসাইটির মহিলা শাখার সভাপতিও নির্বাচিত হন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রধানত অনাথা ও বিধবা মহিলাদের কল্যাণের জন্য 'সখি-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন কন্যা হিরন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত বিধবা-শিল্পাশ্রমের সভাপতি। স্বামী জানকীনাথের সঙ্গে রাজনীতির চর্চাতেও আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন প্রতিনিধি হিসাবে। ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে সম্মান জানায়।
১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৯১২-১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে স্বর্ণকুমারীর লেখা ভ্রমণ কাহিনি ভারতী পত্রিকায় ছাপা হলেও সেগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনি - ১২৯৩ (১৮৮৬) সালে প্রকাশিত প্রয়াগ ভ্রমণ, ১২৯৫ (১৮৮৮) সালে প্রকাশিত দার্জিলিং ভ্রমণ, ১২৯৬ (১৮৮৯) সালে প্রকাশিত গাজিপুর ভ্রমণ, ১২৯৮-৯৯ (১৮৯১-৯২) সালে প্রকাশিত সোলাপুর ভ্রমণ, ১৩০২ (১৮৯৫) সালে প্রকাশিত উটি ভ্রমণ ইত্যাদি। এছাড়া ১৩০৬ (১৮৯৯) -এ প্রকাশিত 'পেনে প্রীতি' এবং ১৩২০ (১৯১৩) সালে প্রকাশিত 'পুরী' লেখাদুটিও খুবই আকর্ষণীয়।]

প্রয়াগ দর্শন

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১)

মুসলমানদের এলাহাবাদ অর্থাৎ আল্লার স্থান আর আমাদের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ,- এখানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া কত পাপী তাপী তরিয়া গেল, অধম আমার কিছু হইল না, আমি যে পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম - তাহা যেমন তেমনি রহিয়া গেল, এখানে আসিয়া অবধি আমার একদিন গঙ্গাস্নান হয় নাই। এই শীতের দেশ, ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নানের কথা মনে করিতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে, - তবু না হয় এক দিন কষ্টে শ্রষ্ঠে তাহাও করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম পাণ্ডাদের কিছু কিছু দিয়া মাথা না মুড়াইতে পারিলে শুধু গঙ্গাস্নানের ফল হয় না। তা প্রথমটিতে আমার আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয় কথাটি শুনিয়া অবধি এমনি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে সেই দিন হইতে এই সহজ পুণ্য লাভের আশাটা একেবারে ছাড়িয়া বিজ্ঞ দার্শনিক হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি - এত সহজে পাপমুক্ত হইয়া তৃপ্তি নাই। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মকে জয় করা উচিত। যাহউক তাই বলিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অন্য কোন সহজ উপায় পাইলে আমি যে ছাড়িয়া কথা কই তা নয়, - মাথা না মুড়াইয়া আর এই শীতের সময় গঙ্গাস্নান না করিয়া শুধু স্থানদর্শন দ্বারা যতদুর পুণ্য লাভ করা যাইতে পারে তাহার বড় বাকী রাখি নাই, এখানে দেখিবার মত যাহা আছে সকলি প্রায় দেখিয়া লইয়াছি।
প্রয়াগের প্রধান মাহাত্ম্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পুণ্য মিলন-স্থলে। এখান হইতে সরস্বতী যদিও অনেক দিন অন্তর্ধান করিয়াছেন (পাণ্ডারা বলে অন্তঃশীলা বহিতেছেন) কিন্তু গঙ্গা যমুনার যুগলরূপ এখানে আসিয়া যিনি না দেখেন তাঁর আসাই মিথ্যা। আমরা নৌকা করিয়া একদিন এই সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলাম। যমুনার কালজলে নৌকা ভাসিল, যমুনাপুলের জল-প্রোথিত প্রকাণ্ড স্তম্ভের মধ্য দিয়া তরতর বেগে নৌকা দুর্গ প্রাকারের নিকটে আসিয়া পড়িল। এই দুর্গ আকবর সাহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজেরা এখন ভোগ দখল করিতেছেন। একদিন দুর্গের সিংহাসন-আকারে-গঠিত বারাণ্ডার উপর বসিয়া মোগল সম্রাট যখন গর্ব্বভরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন - তখন তিনি জানিতেন না পেন্টুলুনের মধ্যে কামিজ কসা, রাঙ্গামুখওয়ালা, সমুদ্রপারের সামান্য সৈনিক বাচ্ছারা এক দিন সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমান দর্পভরে দূরবীনের ভিতর দিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিবে। এ জ্ঞানটা সে দিন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।
কি প্রকাণ্ড দুর্গ! ইহার গঠনই বা কি মজবুত। দুর্গের পশ্চিম দিকের প্রাকার ভিত্তি ঠিক জলের উপর হইতে উঠিয়াছে, কত শতাব্দীর বর্ষার ভীম তোড় ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তবু দুর্গ এখনো অটল-পাষাণের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, ভবিষ্যতের শত সহস্র বৎসরের অত্যাচারকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ভীমদর্পে অপেক্ষা করিতেছে। কি মসলায় গঠিত হইয়া দুর্গের গাঁথনি এত কঠিন হইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা তাহা এখনো আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নদীর ধারে দুর্গ প্রাকারের এক স্থানে ইহাঁদের আমলে একটু ফাটিয়া যায়, ইহাঁরা তাহা যতবার মেরামত করিতেছেন, ততবারই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই ঠিক দুর্গের অন্য স্থানের মত ইহা মজবুদ করিতে পারিতেছেন না। যমুনার তীরে দুর্গের ঠিক নীচে একটি ধ্বজা পোঁতা দেখিলাম, এই ধ্বজা-নিম্নস্থ কূপেই নাকি এখন সরস্বতী বিরাজিত - তাই ইহার নাম সরস্বতী কূপ। মাঝিরা বলিল উপর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে কূপের জল দুধের মত শাদা দেখায়। এই কূপে পাণ্ডাদের বিলক্ষণ উপায় হয়। দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। পূর্বে যমুনার মত গঙ্গাও দুর্গের গা ঘেঁসিয়া বহিত। এদেশের একটি প্রবাদই আছে,

দরিয়াবাদ দরিয়া কিনারে, ফরিয়াবাদ নিশানী,
আকবর যো কিল্লা বানায়া, ত্রিবেণীকা পাণী।

এখন গঙ্গা একটু সরিয়া পড়িয়াছে, তবে বর্ষাকালে অবশ্য এখনো গঙ্গা দুর্গের ভিত্তিতে আসিয়া লাগে। গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে জলের কি তোড়, দুইটা প্রকাণ্ড

গঙ্গা-যমুনা সংযোগস্থল (ত্রিবেণী তীর্থ)

জলরাশিই একটার উপরে একটা ঝাঁপাই ঝুড়িতে ঝুড়িতে অবশেষে এক হইয়া প্রশান্ত ভাবে সরিয়া পড়িয়া সমুদ্র পানে চলিয়াছে, দুই সতীনে কে স্বামীর কাছে আগে পৌঁছিবে - এই বিবাদে উন্মত্ত হইয়া যেন একজন একজনকে ভীমবেগে ছাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে। ঠিক সঙ্গমস্থানটি দেখিলে কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি মনে পড়ে। আধো কাল আধো শাদা, আধো জটা আধো চিকুর, এই আধ আধ রূপে যেন দিক ভরিয়া গিয়াছে। আধো আধো মিশিয়া এক হইয়া গিয়াও দাম্পত্য প্রেমের মিলনের মত গঙ্গা যমুনার স্বাতন্ত্র্য লোপ হয় নাই।

এখানে নৌকার উপর হইতে গঙ্গার দুই পারের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। আমাদের ডানদিকে (এলাহাবাদের পরপারে গঙ্গার উপরে খানিকটা লইয়া এবড়ো খেবড়ো উচু নীচু পাহাড়ময় স্থান, ইহার নাম ঝুসি - ইহার কোন অংশে কোন কেল্লার ভগ্নাংশ, (শোনা যায় এপারে ৪ টা কেল্লা ছিল) কোন স্থানে বা কয়েকটা কুঁড়েঘর - কোথায় বা গাছ পালার মধ্যে একটা সামান্য মন্দির, আর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে তীরোত্থিত সিঁড়ি সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র ইটের দোতালা বাড়ী অতি দূর হইতে লোকের নজরে পড়িতেছে। (এখানে একজন পরমহংস বাস করেন - এখানকার লোকেদের তাঁহার প্রতি পরম ভক্তি, আমরা তাঁহার কাছে দুই তিনবার গিয়াছিলাম।) এই পাহাড়ময় স্থান খানিকদূর গিয়া সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে, শ্যামশষ্যপূর্ণ এই সমক্ষেত্রতীর আবার আমাদের পশ্চাতে যমুনার তীরের সহিত মিশিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পূর্ণ গঙ্গার এই তীর দেশ দেখিলে সুখ দুঃখে উদাসীন নিষ্কাম সন্ন্যাসীর গম্ভীর মূর্ত্তি মনে পড়ে, আর আমাদের বামদিকের বেণী ঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংসার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ ঘাটতীর লোকে লোকে নিশানে নিশানে একাকার। (ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়) সেই নিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার জলময় কূলে কূলে,- সারি সারি তক্তাপাতা। গঙ্গা স্নান করিয়া কেহবা তক্তার উপর বসিয়া ফোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে, কেহবা তক্তাতে বইয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্নান করিতেছে, আর গঙ্গার জলের সারবন্দি লোকের কথাই নাই। গঙ্গার ঠিক ধারে - এমন কি ঠিক বা জলের উপরও মাঝে মাঝে এক একখানা অস্থায়ী বন্দবস্তের সামান্য রকম আটচালা দেখা যাইতেছে, শোনা গেল তাহার একখানিতে সেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আসিয়া কল্পবাস করিতেছেন। তীরে নানা রকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তাল পাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটীর ঢিবি, পাথরের ঢিবিকে রং চঙ্গে কাপড় পরাইয়া ঠাকুর সাজাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। যাত্রীদের এই সকল মূর্তিকেই দক্ষিণা দিয়া যাইতে হয়। ইহা ছাড়া সত্যকার দোকানঘর দেবদেবীর মূর্ত্তিরও এখানে অভাব নাই। যখন বর্ষাকালে এই তীর ডুবিয়া যায় তখন পাণ্ডারা উপরে ফোর্টে যাইবার উঁচু রাস্তার ধারে সমস্ত দোকান তুলিয়া আনে। বর্ষাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। এখন গঙ্গা এই রাস্তা হইতে কত দূরে পড়িয়াছে। এখন এই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দেখ তোমার সম্মুখে নীচে সুদূর প্রসারিত বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে, সেই বিশাল চড়ার এক পাশে অতি দূরে একটা সূক্ষ্ম রেখার মত গঙ্গা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে। এই সরু গঙ্গা দেখিলে তাহাকে গঙ্গা মনে হয় না, সে যেন একটা স্বপ্ন দৃশ্য। কে জানে নৌকার উপর অপেক্ষা এই উঁচু রাস্তার উপর হইতে গঙ্গার এই দৃশ্যটা যেন আমার বেশী ভাল লাগে।

এই রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় একজন বৃদ্ধ জৈন বসিয়া আছেন এইখানে বেড়াইতে আসিয়া আমরা দুই দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি অন্ধ, গাত্রে কোন বস্ত্র নাই, পরণে নেংটিমাত্র, তাঁহার দাড়ী বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই দিনই দেখিলাম - তিনি বিজির বিজির করিয়া মালা জপিতেছেন। আমরা কথা কহিলাম - তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চেলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন "কেহ আসিয়াছে কি?" তাহারা বলিল "হাঁ"। আমরা চেলাদের দিয়া তাঁহাকে দুএক কথা কি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধের তাহা ইন্দ্রিয়গম্য হইল না তিনি অন্যরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন, চেলারা হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধের নাম সুরদাস - শুনিলাম অনেক দিন হইতে দিন রাত্র নাই, শীত রৌদ্র নাই সমান এই স্থানে বসিয়া আছেন। গবর্ণমেণ্ডের রেকর্ডেই পাওয়া যায় - তিনি ৫৫ বৎসর কাল এইরূপে বসিয়া আছেন, অনেকে বলেন - আরো বেশী দিন হইতে তিনি এইখানে বসিয়া আছেন। কি অসীম ধৈর্য্য! আগে আগে নাকি রাত্রি দুইটার সময় একবার করিয়া তিনি হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন - এখন এমন শক্তিহীন - যে চেলারা তুলিয়া না লইয়া গেলে তিনি আর নড়িতে পারেন না। ইনি কাহারো নিকট ভিক্ষা করেন না, ইচ্ছা করিয়া যে যাহা দেয়। শুনিলাম এখন ইহাঁর এত টাকা জমিয়াছে - যে ইহাঁর নামে এলাহাবাদে একটী ব্যাঙ্ক চলিতেছে, পরে তাঁহার চেলারাই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বেণীসঙ্গম দেখিয়া আমরা অক্ষয়বট দেখিতে এই রাস্তা দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুর্গ-সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া যাখন শস্ত্রধারী প্রহরীদের নিকট দিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে লাগিলাম - গাটা যেন ঝম ঝম করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল - আর কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল শুনিলাম এক, এই দুর্গ দেখিয়াই নাকি ইংরাজেরা সেই ধরণে কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রতি দ্বারেই শস্ত্রধারী প্রহরী, এক দ্বার অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বার পর্যন্ত স্থান যেন সৈনিকপূর্ণ গোলা-কামানপূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। দুর্গের পয়ঃপ্রণালীর এমনি বন্দবস্ত যে ইচ্ছামাত্র দুর্গ দ্বারের নিম্নের দুই পার্শ্বের স্থান একেবারে জলময় করিয়া তোলা যায়,- শত্রুআসিতে হইলে প্রথমতঃ সেই জল পার হইয়া দুর্গবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে। সচরাচর সকলে দুর্গের তৃতীয় দ্বারের ভিতর পর্য্যন্ত যাইতে পারে - আমরাও তিনটি দ্বার পার হইলাম, দেখিলাম - প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে দেশী সৈন্য তৃতীয় দ্বারে ইংরাজ সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত। যদি মরিতে হয় আগে আমাদের দেশের লোকগুলা - যা শত্রুপরে পরে। পাশ না থাকিলে চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া কেহ আসল দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে আর কি অস্ত্রাগার প্রভৃতি আছে। আমাদের পাশ ছিল না - আমাদেরও ইহার মধ্যে যাওয়া হইল না। কিন্তু এবার না হউক - আর একবার আমরা পাশ লইয়া অস্ত্রাগার দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি কাণ্ড! ঘরের চারিদিকে কত রকম করিয়া বন্দুক সাজান, দেয়ালে দেয়ালে বর্ষা তরবার সঙ্গীন ঝক ঝক করিতেছে - যে দিকে চাই - চোক যেন ঝলসিয়া যায়। যাক - আমরা তৃতীয় দ্বার পার হইয়াই সম্মুখের বাগানে অশোক স্তম্ভ দেখিলাম। স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি পালিভাষায় স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে। এদেশে ছোট লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। এ গদা দেখিয়া ভীমকে কল্পনা করা সহজ কথা নহে। এই স্তম্ভ ছাড়াইয়া কিছু দূরেই অক্ষয়বটের সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের কাছে আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল - আমরা কয়জনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। নামিবা মাত্র অন্ধকারে চ'খে যেন ধাঁদা লাগিয়া গেল - একজন পাণ্ডা আলো হাতে লইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়াই সুড়ঙ্গের এক পাশে - আমাদের সম্মুখে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি, তাহা দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল - " ইহা প্রয়াগের ত্রিবেণীমাধবের মূর্ত্তি। যেখানে এখন এই দুর্গ দেখিতেছ এই দুর্গ নির্ম্মাণের আগে এ স্থান গঙ্গার জলে পূর্ণ ছিল, আকবর তাহা দেখিয়া ত্রিবেণীমাধবের কাছে আসিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন - যে ৫০০ বৎসরের জন্য গঙ্গা কিছু সরিয়া যাউন বেণীমাধবজি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন '৫০০ বৎসর কেন আমি গঙ্গা লইয়া হাজার হাজার বৎসরের জন্য এখান হইতে হটিয়া যাইতেছি - তুমি এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ কর'।

গল্প শুনিতে শুনিতে সুড়ঙ্গটা দেখিয়া লইলাম, সুড়ঙ্গটা উচ্চে দেড় মানুষ আন্দাজ, প্রস্থে পাশাপাশি বোধ হয় - ২/৩ জন লোক এক সঙ্গে চলিতে পারে - আর দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ২৫। ৩০ হাত মনে হইল। সুড়ঙ্গের দুই পাশের দুই দেয়ালে অনেক কোলঙ্গা, এক এক কোলঙ্গায় এক এক দেবতামূর্ত্তি; মূর্ত্তিগুলি সবই প্রায় পাথরের - তাহার কোনটারই না আছে ছাঁদ না আছে শ্রী, সবই নিতান্ত অদ্ভুত রকমের। কোলঙ্গাস্থিত দেবতাগুলির নাম বলিতে বলিতে পাণ্ডা আমাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে একটি কোলঙ্গায় রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তির কাছে প্রস্তর খোদিত আলাদা একখানি পা দেখিলাম। শুনিলাম, উহা ভগবানের শ্রীচরণ - বিনা আয়াসে আশার অতীত ফল লাভ করলাম - ভগবানের চরণ দর্শন ঘটিল - দুঃখের মধ্যে তাহাতে সশরীরে স্বর্গ লাভ ঘটিল না। পাণ্ডা বলিল রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় যখন প্রয়াগ হইয়া যান তখন এই পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডার সে কথা শুনিয়া আমাদের সঙ্গের একজন দেশী হিন্দু চাকরের মনে এতটা ভাবোদয় হইল - যে সে ওহো ওহো করিয়া উঠিল - চোখে জল আসিয়াছিল কি না সেটা ঠিক দেখিতে পাই নাই। অক্ষয়বটের কাছাকাছি আসিয়া সুড়ঙ্গের মেজেতে কয়েকটি শিব স্থাপনা দেখিলাম - একটা শিবের পাথর খানিকটা ভাঙ্গিয়া গেছে। পাণ্ডা বলিল আরঞ্জীব ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন - ভাঙ্গিবামাত্র রক্তে সুড়ঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। আরঞ্জীব কি রূপ অত্যাচারী ছিলেন, কত হিন্দু দেব দেবী নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও সে গল্প করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে আমরা সুড়ঙ্গের প্রায় শেষ ভাগে আসিয়া বটবৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সেই রৌদ্রহীন বায়ুহীন নিরালোক বদ্ধ প্রদেশে দু একটি নবীন পাতা মুঞ্জরিত একটি ছিন্নমস্তা জীবন্ত বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

গাছের প্রধান যে গুঁড়ি তাহা মাটি হইতে আন্দাজ আধ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া সেখান

হইতে অপেক্ষাকৃত দুইটা ছোটগুঁড়িতে ভাগ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রধান গুঁড়ির দুইদিক হইতে দুইটা মোটা মোটা গুঁড়ির মত ডাল উঠিয়া গুহার ছাতের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। গাছ সুড়ঙ্গের মাথা স্পর্শ করিবে ভয়ে - গুঁড়ির ছাদমুখী আগা দুইটি একেবারে কাটা। সুতরাং এই গাছের চেহারা মাটীতে পোঁতা একগাছা মাথা কাটা খোলা রান্নার বেড়ীর মত। প্রধান গুঁড়ির দুই পাশে দুই জায়গায় এক একটি নিতান্ত ছোট সরু ডাল বাহির হইয়াছে, সেই ডালে কাঁচা কাঁচা দুই চারিটি পাতা, তাহা ছাড়া সমস্ত গাছে একটি ডাল নাই, একটি পাতা নাই, বেড়ীর ডাণ্ডার মত সেই মোটা মোটা গুঁড়ি দুইটিই এই গাছের সর্ব্বস্ব। এই গুঁড়ি দুইটি গাঁটে গাঁটে ভরা - সেই গাঁট গুলি দেখিতে কাঁচা কাঁচা, মনে হয় উহা হইতে কিছু দিন পরে নূতন পাতা বাহির হইবে। কিন্তু শুনিলাম - নূতন পাতা এগাছে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর এবার নূতন পাতা দুই একটি বাহির হইয়াছে, আবার অল্পদিনের মধ্যে শুকাইয়া যাইবে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বিনা বাতাসে বিনা আলোকে গাছটি বাঁচিয়া আছে ইহাই আশর্য্য। এই গুহা অক্ষয়বটের জীবন্ত সমাধি। পৃথিবীতে শুনিয়াছি সাতটি আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে আমার ত মনে হইল এই অক্ষয় বটকে আর একটি আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত।

অক্ষয় বট (এলাহাবাদ ফোর্ট মধ্যস্থ)

এ গাছটি কত কালের কেহ বলিতে পারিল না - আমাদের পথপ্রদর্শক পাণ্ডা বলিল - "ইহা সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছে। আবার যখন প্রলয় কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইবে তখন এই গাছ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি পাতা উৎপন্ন হইয়া সেই জল ঢাকিয়া দিবে - আর সেই তিনটি পাতাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্সৃষ্টি করিবেন"। পাণ্ডাটি দেখিলাম গল্পের ভাণ্ডার, যা জিজ্ঞাসা কর উত্তর মুখে লাগিয়া আছে, তা সে উত্তর তুমি ঠিক অঠিক যা মনে করে লও তাহাতে তার কিছুই আপত্তি নাই। অক্ষয়বটের পর অল্প দূর গিয়া সুড়ঙ্গের শেষ, শেষটা একেবারে বন্ধ নহে, একজন মানুষ যাইতে পারে এইরূপ ফাঁক আছে। পাণ্ডা বলিল এই সুড়ঙ্গ বরাবর কাশি পর্য্যন্ত গেছে। পাণ্ডার কাছে আকবরের জন্মের একটি বড় মজার গল্প শুনিলাম। অক্ষয় বটের কাছাকাছি সুড়ঙ্গের মেজের এক জায়গায় একটু খোঁড়া খোঁড়া গর্ত্তের মত আছে, পাণ্ডা তাহা দেখাইয়া বলিলেন "এইখানে বালমুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী বসিয়া ধ্যান করিতেন, একদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁহাকে যে দুধ পান করিতে দিয়াছিল তাহাতে একগাছি গরুর লোম ছিল, সেই লোম মুখে পড়িবা মাত্র ব্রহ্মচারী বলিলেন - হা শিষ্যগণ কি করিলে - আমাকে এমন পাপলিপ্ত করিলে! এই বলিয়াই তিনি তখনি তনুত্যাগ করিলেন, আর সেই পাপে মুসলমানের ঘরে আকবর বাদশা রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।" আকবরের প্রতি দেশের লোক কিরূপ সন্তুষ্ট ইহা হইতে বুঝা যায়। আকবরের এবং তাঁহার মন্ত্রী বীরবলের প্রশংসা এদেশের লোকের মুখে ধরে না। পাণ্ডা বলিল আকবরই অক্ষয় বটের এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, আর মন্ত্রী বীরবল এই সুড়ঙ্গ স্বর্ণনির্ম্মিত করিতে গিয়াছিলেন - শেষে তাহাতে দস্যু উপদ্রব হইবে ভাবিয়া তাহা করেন নাই। এত গল্প করিয়াও তবু সেদিন পাণ্ডার অনেক গল্প বাকী রহিয়া গেল তাই পরদিন তাহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে বলিলাম। সেদিন আসিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হাতে পড়িয়া তাহাদের আয়-পসার কিরূপ কমিয়াছে সেই দুঃখই সে বেশী করিল; যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই, -

ইংরাজদের ইচ্ছা নয় যে পাণ্ডারা ফোর্টে থাকিতে পায়, তাহাদের উঠাইবার জন্য তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু আকবরের পরোয়ানার জোরে তাহারা বাঁচিয়া গেছে, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণের সময় পাণ্ডাদের এইরূপ পরোয়ানা দিয়াছেন যে "তাহারা বংশানুক্রমে এই দুর্গমধ্যে থাকিয়া এই বৃক্ষের আয় ভোগ দখল করিবে - এখান হইতে অন্য কোন রাজা তাহাদিগকে উঠাইতে পারিবে না।" ইংরাজেরা এ মকদ্দমায় পরাজিত হইল বটে কিন্তু রবিবার দিন যাত্রীদের এখানে আসা বন্ধ করিল, পাণ্ডাদের তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি, তাহারা অনেক হেঙ্গাম করে প্রয়াগবাসী বরোদার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দিনকর রাওকে ধরিয়া গভর্নর জেনারেলের কাছ হইতে ২।৩ বৎসরমাত্র সে নিয়ম রহিত করিবার হুকুম আনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা যে এখনো দূর হইয়াছে তাহা নহে, দিনের মধ্যে সকল সময় যাত্রী অক্ষয়বট দেখিতে আসিতে পায় না, সকালে বিকালে কয়েক ঘন্টা করিয়া অক্ষয়বট দেখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ইহার উপর (পাণ্ডারা প্রতি দিন যত লাভ করুক না করুক) গোরা প্রহরীদের প্রতিদিন নাকি পাঁচসিকা করিয়া ঘুষ দিতে হয়, নহিলে তাহারা যাত্রী ভাগাইয়া দেয়। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, দেখিলাম - অনেকে ফুল দিয়া গাছ পূজা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন সন্তান কামনায় আসিয়াছে।

খসরুবাগ এখানকার দেখিবার আর একটি প্রধান স্থান। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি এ বাগান প্রস্তুত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এই সাধের বাগানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এখন এ বাগান গবর্ণমেন্টের হাতে। ৩।৪ শত টাকা বেতনে একজন নাকি এ বাগানের ইংরেজ তত্ত্বাবধায়কই আছে। বাগানের দুইটি গেট। প্রথম গেটের ভিতরকার কম্পাউণ্ড এখন বাগানের সামিল নহে, সেখানকার দোকান রাস্তা এখন গবর্ণমেন্টের। আগে এইখানে বাগানের খাস দোকান বসিত। ইহার কাছে একটি কূপ-বাটিকা আছে। দোতালা বাড়ির মধ্যে কূপ, কূপের ভিতর পর্য্যন্ত সিঁড়ি, গরমি কালে বেগমেরা আর কি এইখানে বাস করিতেন। প্রথম গেটের কমপাউণ্ডের সীমায় দ্বিতীয় আর একটি প্রকাণ্ড গেট - ইহা উচ্চে ৫০ হাতেরও হয়ত অধিক হইবে ও এই গেটের শিল্প-কার্য্যও বড় চমৎকার। গেটের মধ্যে ঢুকিয়া বাগানের রাস্তার দুই পাশে চাহিয়া দেখ চিত্র বিচিত্র মখমল শয্যা বিছান রহিয়াছে, সে মখমল পশমের মখমল নহে, ঘাসের মাঝে মাঝে নানান বর্ণের বিলাতি ফুল ফুটাইয়া ঠিক মখমলের মতো সাজান হইয়াছে। তারপর ফুল বাগান, হাজার হাজার নানা রঙের নানা আয়তনের গোলাপ একসঙ্গে ফুটিয়া সৌরভে চারদিক আকুল করিয়া রাখিয়াছে, গোলাপফুলের এমন কারখানা আর কখনও দেখি নাই। অন্য ফুল যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে খসরুবাগ গোলাপের জন্যই প্রসিদ্ধ।

বাগানের মধ্যে এক লাইনে তিনটি সমাধি মন্দির। প্রথমটি খসরুর মাতার, দ্বিতীয়টি শূন্য। খসরুর এক স্ত্রীর জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু রুগ্নাবস্থায় দিল্লিতে বায়ু পরিবর্তন করিতে গমন করিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার দেহ প্রোথিত হয় - সুতরাং এখানকার মন্দিরটি শূন্যই রহিয়া গিয়াছে। তৃতীয় মন্দিরটিতে স্বয়ং খসরু ও তাঁহার দুই বালক পুত্র শয়ান আছেন। হতভাগ্য খসরু সাজাহানের প্ররোচনায় তাঁহার দুইটি বালক পুত্রের সঙ্গে একই দিনে একজন হাবসি ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হন। খসরু ও সাজাহান দুই সহোদর ভ্রাতা, ইহাঁদের মাতা মানসিং হের ভগিনী। পিতা জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই রাজ্যলোভে দুই ভাইয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্য দুই ভাইকে স্বতন্ত্র রাখিবার ইচ্ছায় জাহাঙ্গীর খসরুকে এলাহাবাদের শাসনভার দিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। সাজাহান ও খসরুর বিবাদে খসরুর মাতা সাজাহানকেই দোষী দেখিতে পান ও তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না স্থির করিয়া পুত্র খসরুর সহিত এলাহাবাদে আগমন করেন। খসরু এখানে আসিয়াও নিস্তার পাইলেন না। একদিন তিনি ও তাঁহার দুই পুত্র খসরুর সহিত আহার করিতেছেন, মুহূর্তের জন্য অন্য ভৃত্যবর্গ সরিয়া গিয়াছে - এই সময় খসরুর এক ভৃত্যবেশি সাজাহানের লোক তিনজনকে একসঙ্গে হত্যা করে। কিন্তু পরে সাজাহান দোষমুক্ত হইবার জন্য ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। পুত্রশোকে রাজ্ঞীও কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন।

যে ফকীরের উপর এই তিনটি সমাধি মন্দির দেখিবার ভার, আর যে আমাদের সঙ্গে লইয়া মন্দিরগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহার কাছেই আমরা এই সব কথা শুনিলাম। ফকির পারস্য দেশের ভাষা বেশ জানে। সমাধি মন্দিরে খোদিত কথা পড়িয়া সে আমাদের তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিল। খসরুর সমাধি মন্দিরের ভিতর দিকের দেয়ালে অনেকগুলি এই মর্ম্মের কবিতা লেখা আছে - ধনের জন্য কি-না হয় - পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া পড়ে, ভাইকে ভাই নিধন করে - ইত্যাদি। একস্থলে অন্যরূপ অর্থে দুই ছত্রের কবিতা বড় ভাললাগিল - তাহার অর্থ এই, "এই যে নবাব খসরু - ইনি অতি সূক্ষ্মবস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারিতেন না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, এখন কত মন পাষাণভারের নীচে স্বচ্ছন্দে শুইয়া আছেন।"

খসরুর গোরের পাথরের উপর কতকগুলি ফুল ছড়ান দেখিলাম। শুনিলাম, মুসলমানেরা অনেকে অনেক কামনা করিয়া খসরু ও তাঁহার পুত্রদিগকে পূজা করিয়া যায়, বিনা-অপরাধে হত হইয়া আর-কি ইহাঁরা "সহিদ" অর্থাৎ দেবতা হইয়াছেন।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔদাস্যময় কষ্টের ভাব সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সমাধিস্থল দেখিলে মনে কি যে একটা কিছুই কিছু নয় ভাব আসিয়া পড়ে, সহজে সে ভাব মন হইতে তাড়ান যায় না। অথচ এই কষ্টেরও এমন একটা আকর্ষণ আছে - সমাধি-ক্ষেত্রে আসিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না, - কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত, মৃত্যুকে সকলে দূরে রাখিতে চায়, মৃত কেহ দেখিতে চায় না - তবু শব দেখিলে তাহার দিকে না চাহিয়া যেন কেহ থাকিতে পারে না। একদিন এখানকার ইংরাজদের গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। কত সাধের স্ত্রী মরিয়াছে - স্বামী সেই মৃতদেহের উপর উচ্চ স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কত স্ত্রী মৃত স্বামীর গোরের উপর অশ্রুমাখা কাতরোক্তি লিখিয়াছেন। একজন ধনীর একটি মাত্র পুত্র একুশ বৎসর বয়সে ঘোঁড়া হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, একজন একে একে চারিটি পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে এই খানে শুয়াইয়া রাখিয়া গেছেন, সংসারে বুঝি আর তাহার কেহ নাই। কত পুত্র কন্যা পিতামাতা ভাই ভগিনী স্বামী স্ত্রী অশ্রুজল ও হৃদয় বেদনা মাখাইয়া প্রিয় মৃতের মাটি শয্যার উপর ফুল শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। এ যে স্থল এখানে অশ্রু বেদনা স্নেহ প্রেম কিছুই পৌঁছে না। সমাধি ক্ষেত্রে আসিলে স্নেহ প্রেমের অশ্রু বেদনার এই উপেক্ষা দেখিয়া মর্ম্ম বিদ্ধ হয়, সংসারের অনিত্যতা প্রাণের ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে, অহঙ্কার ভুলাইয়া দেয়, - ক্রমে সেই কষ্টের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্ত ভাব অন্তঃশীলা বহিতে আরম্ভ হইয়া সেই কষ্টটাকে উপভোগ্য

করিয়া তুলে, তখন সমাধি মন্দির হইতে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার মধ্যে একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(২)

গঙ্গার যেমন বেণী ঘাট প্রধান, যমুনার তেমনি বড়ুয়া ঘাট প্রধান। কিন্তু বেণী ঘাট সঙ্গমঘাট বলিয়া ইহা একটি প্রধান তীর্থ স্থান, কাজেই এঘাটে যেমন লোকের ভিড়, নিশানের কারখানা বড়ুয়া ঘাটে তাহার কিছুই নাই।

আমরা দুই দিন নৌকা করিয়া যমুনায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি - এখানকার নদীতে স্রোতের তেমন জোর নাই, কেননা সমুদ্র নিকটে নহে বলিয়া গঙ্গা যমুনায় এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলেনা, সুতরাং নৌকা যেদিকে ইচ্ছা অতি সহজে চালান যায়। এখানে নৌকার চলাচল যে বেশী আছে তাহা নয়, যমুনার পুলের কাছে - নৌকার আড্ডাস্থলেই মোট ৪।৫ খানি মাত্র নৌকা সর্ব্বদা বাঁধা থাকে, আর নদীর বুকে মাঝে মাঝে দু-এক খানি নৌকা চলিতে দেখা যায়। ধোপারাই এখানকার নদীর শোভা। যমুনার ধারে ধারে সারা দিনই প্রায় সার গাঁথিয়া ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে - কোথায় যমুনা পুলিনে শ্যামের বংশীধ্বনি আর কোথায় ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত! বড়ুয়া ঘাটের কাছে যমুনার ধারেই দুইটি বড় বড় অট্টালিকা, আর ঘাট হইতে কিছু দূরে সুন্দর একখানি বাঙ্গলা। বাঙ্গলাখানি মিশনারীদের, আর অট্টালিকা দুইটির একটি কাশীর রাজার, একটি একজন ফকীর। ফকীর সম্প্রতি মরিয়াছে। কাশীর রাজার বাড়ীটির প্রস্তর-গেট চন্দন কাঠের বাকসের মত বড় সুন্দর লতাপাতা ফুলকাটা। এদেশের লোকে পাথরের উপর বড় সুন্দর কাজ করিতে পারে, - এখানকার ধনী মাত্রেরই প্রায় পাথরের বাড়ী।

প্রথম দিন আমরা নৌকা করিয়া বড়ুয়া ঘাট হইতে আন্দাজ এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়া দেখিলাম গহনা গাঁটী ও রঙ্গি কাপড় পরা স্ত্রীলোকেরা ঝমঝম করিয়া ও ফিটফাট পুরুষেরা সার গাঁথিয়া তীর দিয়া চলিয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় মাঝিরা বলিল - "নিকটে শ্যামা মাজির গাছ তলায় মেলা ছিল - সেখান হইতে লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে।" শুনিলাম সে বৃক্ষটি নিকটেই নদীর তীরে। আমরা সেইখানে নোউকা লাগাইতে হুকুম দিলাম। খানিক পরে একটা পাহাড়ের মত উঁচু জায়গার নীচে নৌকা থামিল - আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিয়া সেইখানে উঠিলাম, দেখিলাম সেই উচ্চস্থানে একটা বাঁধান গাছতলায় কতকগুলা ভাঙ্গাচোরা মূর্ত্তি, তাহাই শ্যামামায়িজি। সকালে এইখানে মেলা হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলো সব সিঁদুর মাখান, আর নিকটে অনেক ভাঁড় কোড় পড়িয়া আছে - তাহাই মেলার অবশেষ। সেই উচ্চ পাড়ের নিম্ন দেশ দিয়া যমুনার একটা শাখানদী বর্ষাকালে কানপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, এখন তাহার শুষ্ক চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই উচ্চ স্থান হইতে যমুনা দেখিতে কি সুন্দর - নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত যমুনার জল এত ঘোর নীল যে সমুদ্র ও যেন অত নীল নহে। সেই কাল জলে - তীরের বৃক্ষছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে - সূর্য্যের কিরণ চিক চিক করিতেছে, সমস্ত আকাশটা তাহার মধ্যে ঢেউএর মত উঠিতেছে পড়িতেছে, একটা ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম জগৎ সংসারের যেন লীলাখেলা চলিয়াছে।

সুজান দ্বীপ

সেদিন আর বেশীদূরে যাওয়া হইল না সেইখান হইতে বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন খুব ভোরে নৌকায় উঠিয়া সেস্থান ছাড়াইয়া আরো অনেক দূরে যমুনার বক্ষে একটি পাহাড় দ্বীপ উঠিয়াছে, দুইটার সময় সেইখানে পৌঁছিলাম। দ্বীপটির নাম সুজান দ্বীপ। দ্বীপটি স্তরে স্তরে দীর্ণ বিদীর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্ত্তি। তাহার পদতলে নদীর জলে বড় বড় ভাঙ্গা পাথর গড়াগড়ি যাইতেছে - তাহার গায়ে এক একটা বড় বড় চাঙ্গড়া এমনি ভাবে ঝুঁকিয়া আছে - যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। যমুনার জলের মধ্যে স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদারিত সেই উচ্চ পাহাড়ের মাথায় একটি শিব মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে মন্দির পর্য্যন্ত বরাবর পাহাড় কাটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরটিতে জন মানব নাই, মন্দিরের নিকটে একটি মাত্র নিম গাছ - আর আশে পাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুএকটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া তাহার চারিপাশের অসমান জমি মাজা পাথরের মত ঝরঝরে। মন্দিরের ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে ফার্সি লেখা, শিবমন্দিরে ফার্সি লেখা কেন বুঝিতে পারিলাম না।

এই দ্বীপের সম্মুখে যমুনার তীরে আর একটি উঁচু পাহাড় - মধ্যে একটা জলের ব্যবধান; দেখিলে মনে হয় - এই দুই পাহাড় আগে একটি মাত্র সংলগ্ন পাহাড় ছিল, পরে কোন কারণে ইহাদের মধ্যস্থিত পাহাড় অংশ ভাঙ্গিয়া ইহারা এমন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে সুজান দ্বীপ দেখা হইলে আমরা আবার নৌকা করিয়া তীরে নামিয়া ঐ পাহাড়ের উপর উঠিলাম। ঐ পাহাড়ের উপর সমুখা সমুখি দুইটি মন্দির - একটি কৃষ্ণ রাধার, একটি শিবের। কৃষ্ণ রাধার মন্দিরটি বেশ সুসজ্জিত। এ পাহাড় জন শূন্য নহে, এখানে মন্দিরের কাছে লোক জনের বসতি আছে, মন্দিরের উদ্যান ভূমির মধ্যেই একজন পুরোহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম নবাব সাসুজা তাঁহার একজন প্রিয় হিন্দু কর্ম্মচারীর অনুরোধে - যমুনা বক্ষস্থ ঐ দ্বীপের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহার নিজের নামে ঐ মন্দির ও দ্বীপের নামকরণ করেন, তখন বুঝিলাম শিবের মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া নৌকা ছাড়িতে প্রায় ৪ টা হইয়া গেল। বিকালে যমুনার দৃশ্য কি চমৎকার! পশ্চিম আকাশের লাল আভায় নৌকার পশ্চিমদিকের নদীর জল লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে - সে দিকে নদীর বুকের ভিতর যেন সহস্র সহস্র রাঙ্গা জবা ফুটিয়া উঠিয়াছে - আর তাহার কূলে উঁচু উঁচু সোজা সোজা পাড়ের উপরে ছোট ছোট কুটীর ও বড় ছোট গাছ পালার গায়ে গায়ে সে লালের স্নিগ্ধ লাবণ্য পড়িয়াছে। সেই সোজা পাড়ের ঐ কুটীরগুলি দেখিলে কেমন ভয় ভয় করে - মনে হয় তাহারা যেন নদীর শোভাময় লাল জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই ভাঙ্গন-ধরা তীরের উপর আর এক বর্ষা পর্য্যন্ত কুটীর গুলি যে রক্ষা পাইবে এমন মনে হয় না।

পশ্চিমের এই আলো পথ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম এখনো স্নিগ্ধ লাল-লাবণ্যময়, কিন্তু পূর্ব্বদিক একেবারে অন্ধকার - কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সেই কুয়াসার প্রাণের মধ্যে এক একবার কেবল পুলের দিকের একটা আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে - আর পাশের জানালা দিয়া আকাশের এক একটা তারা চোখের সমুখে আসিয়া পড়িতেছে - দুই একটা তারা নদীর জলে মাঝে মাঝে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। একদিকে আলোক একদিকে অন্ধকার - আমরা মধ্যখানে সন্ধিস্থলে বসিয়া আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমাগত অন্ধকার কুয়াসার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি - সেখানে আশ্রয় ফেলিয়া আসিয়াছি, মানুষ - মানুষ আমরা।

এখানে রাস্তা ঘাটে সহরে মাঠে যেখানে সেখানে মন্দির; এত মন্দিরেও তবু এখানকার লোকেদের আশ মিটে নাই, যেস্থানটি একটু নির্জ্জন, সুদৃশ্য, সেইখানেই একটি বাঁধান গাছতলায় একটা কোন না কোন রূপ মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, বলিতে কি এখানে এমন একটা বড় গাছতলা বা উঁচু ভালরকম জায়গা দেখিলাম না, যেখানে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তি পড়িয়া নাই। আর যেখানেই এইরূপ মূর্ত্তি সেই খানেই এক একটা নিশান পোতা, - নিশান দেখিলেই বুঝা যায় ইহা একটি দেব আড্ডা। এইরূপ মূর্ত্তি পূজার এক একটা বিশেষ দিন থাকে, অনেক দূর হইতে সেদিন সেখানে লোক জমে, দোকান পসারি বসে - একটা মেলা হয়। তাপর যে যেখানে চলিয়া যায় - মূর্ত্তি একাকী পড়িয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে যে প্রথমতঃ এইরূপ স্থলে দেব কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বলিতে কি আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে জীবন্ত কবিত্ব অনুভব করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।

আমরা সর্ব্ব প্রথমে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম মন্দির দেখিতে যাই। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় আরকি এখানে তিন দিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মনে করিলাম কি একটি নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিতে যাইতেছি - কিন্তু লোকালয়ের ভিতর দিয়া ধূলায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা গণ্ডগোল, চিকরা চিকরি - অপরিষ্কার ও ধূলার কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম এই ভরদ্বাজের মন্দির। যত মন্দির দেখিয়াছি এমন অপরিষ্কার ধূলিময় কোনটি দেখি নাই। এখানে দুইটি মন্দির ঘর - এক ঘরে রাম লক্ষণ সীতার মূর্ত্তি এক ঘরে একটি শিবের মূর্ত্তি। দুইটি সিঁড়ি পথ আছে সেইখান দিয়া নীচের অন্ধকার গহবরে নামা যায়। ইহার একটি গহবর বশিষ্ঠ মুনির একটি ভরদ্বাজের তপঃস্থান বলিয়া কথিত। আমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিতে করিতে জনকতক পুরুষমূর্ত্তি-স্ত্রী-পাণ্ডা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিল; মন্দির দেখিব কি আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত; মনে হইল আজ বুঝি এইখানেই কয়েদী হইয়া পড়ি। কমপাউণ্ডের মধ্যে কাছাকাছি আরো অনেক অনেক মন্দির, সকল মন্দিরের লোকেরা একসঙ্গে জুটিয়া নিজের নিজের দেবতার জন্য পয়সা চাহে, নিজের নিজের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য চীৎকার করে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসে, অতিকষ্টে আমাদের দারোয়ানেরা তাহাদের সরাইয়া রাখে। যাই হৌক খানিকক্ষণ তাহাদের চীৎকারের বড়ষিতে নাকানি চোবানি খাইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে ছিপ কাটিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম।

তাহাতেও নিস্তার নাই, গাড়ীর অর্দ্ধেক পথ আবাল বৃদ্ধ বণিতারা চীৎকার করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। এমন বিপদে আর কখনো পড়ি নাই। যদি ভরদ্বাজ মুনি জানিতেন তাঁহার শান্তির আশ্রম এমন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিবে তাহা হইলে বোধ করি ইহার চিহ্নমাত্র তিনি রাখিয়া যাইতেন না।

অলোপীবাগের স্বর্ণচূড়মন্দির - এলাহাবাদ

সহরের মধ্যে রাজার মন্দির নামে আর একটি মন্দির আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একটি প্রস্তর নির্ম্মিত লালবর্ণের নূতন মন্দির। মন্দিরটি সবে ১৬ বৎসর মাত্র একজন রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ দেখিতে, ইহার চূড়াগুলি সব স্বর্ণমণ্ডিত। যে দ্বার দিয়া মন্দিরের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে হয় - তাহা সুবৃহৎ। এই দ্বারদেশে একটি মজার ঘড়ি, একটা নল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া একটা জল পাত্রে জল পড়িতেছে, জলে বাটীটির কতখানি পুরিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়াই সময় ঠিক হইতেছে। বাটীটি একেবারে জলপূর্ণ হইলে তখন তাহা ফেলিয়া নাবার খালি করিয়া লইতে হয়। মন্দিরটি শিব মন্দির, মন্দিরের মধ্যে দেয়ালে অনেক দেব দেবীর চিত্র। শিব মন্দিরের সমুখাসমুখি কমপাউণ্ডের মধ্যে একটি একতালাগৃহে কৃষ্ণ রাধার মূর্ত্তি। সেই গৃহের ছাতে কৃষ্ণ রাধার মাথার উপর কয়েকটি বিলাতি মূর্ত্তি (Statue)। এই মূর্তিগুলি বেশীর ভাগ স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষও আছে, একজন নাইট একটা হরিণ পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দেবমন্দিরে এইরূপ বিলাতি দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম - বুঝি বা বাল্মীকি, লক্ষ্মী, সরস্বতী আজ এইরূপ বেসে শিবের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। আশ্চর্য্যই বা কি! শুনা যায় আজ কাল কোন কোন গৃহে দেবতার পাউরুটি বিস্কুটের ভোগ নহিলে চলে না !

এখানে আর দুইটি যে মন্দির দেখিয়াছি তাহা দেখিতে এমন জমকাল নহে, কিন্তু তাহার সম্মুখের দৃশ্য বড় চমৎকার। দুইটিই গঙ্গার ধারের মন্দির। একটি দারাগঞ্জে অন্যটি সহরের বাহিরে শিবকোটি নামক স্থানে। দারাগঞ্জ নদীর ধারের একটি স্থান, বড় বড় বাড়ী ইমারত মন্দিরে মন্দিরে ইহা ভরা। নদীর উপর হইতে এই স্থানটি দেখিতে ঠিক যেন ছবির মতন, বড় সুন্দর! এখানে আমরা যে মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা বাসুকীর মন্দির - ইহা একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। পাথরের সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া ঘুরিয়া সর্প রাজের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, এই বারান্দা হইতে নীচে গঙ্গা পর্য্যন্ত দুই পাশে দেয়ালওয়ালা একটি বাঁধান ঘাট, বর্ষাকালে সম্মুখের প্রসারিত মাঠ ঢাকিয়া এই ঘাটে জল আসে, কিন্তু এখন গঙ্গা শুকনো হলদে মাঠের আকাশের একপাশে একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত শুইয়া আছে। তাহার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত আকাশ আর চারি পাশে অনন্ত প্রসারিত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। মাঠের সীমান্তে যে বড় বড় গাছ, মন্দিরের উচ্চ ভূমির কাছে তাহাও ঈষৎ উচ্চ সমান সবুজ জমির মত হইয়া পড়িয়াছে, বিকালের প্রশান্ত কনক আভা - হরিদ্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশে শয়ন করিয়া চারিদিকে একটা গম্ভীর নিরাশার ভাব, একটা বৈরাগের তান তুলিতেছে - বাসুকী সহস্র ফনা তুলিয়া তাহারদিকে চাহিয়া সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিতে কাণ পাতিয়া আছে।

শিব কোটির মন্দির ("শিউকোটি" অর্থাৎ শিব মন্দির। ইহা হইতে সমস্ত স্থানটার নামই শিউকোটি হইয়া পড়িয়াছে) আমরা রাত্রিকালে দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি একেবারে সহরের বাহিরে, বড় নির্জ্জন। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। সে দিন পূর্ণিমা, সাদা ধবধবে গম্বুজওয়ালা ছোট মন্দিরের উপর, কাল পাথরের ঘাটের উপর, মন্দিরের নীচের ধূ ধূ কারী বালির চড়ার উপর, দূরে অস্পষ্ট গঙ্গার কাল একটা রেখার উপর জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই ঘুমন্ত জ্যোৎস্নাকে কম্পিত করিয়া পুরোহিতদিগের স্তব গান মন্দিরের মধ্য হইতে স্তব্ধ আকাশে উথলিয়া উঠিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, চারিদিক পবিত্র হইয়া উঠিতেছে - আমার মনে হতে লাগিল আমি ঋষি আশ্রমে সাম গান শুনিতেছি। সেই স্তব শুনিতে শুনিতে পুতঃ হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বালির চড়া ভাঙ্গিয়া নদীর ধারের দিকে চলিতে লাগিলাম। পুরোহিতগণের স্তুতিগান ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতে লাগিল। এখানে কি গভীর নিস্তব্ধ ভাব! নিজের নিশ্বাস শব্দ পর্য্যন্ত যেন এখানে শোনা যায়। এই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধ রজনীতে আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়াই যেন বিস্মিত হইতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল যে, আমরা এখানে কেন আসিলাম। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধভাবে তীরে বালির উপর বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম? গঙ্গার উপরে যেখানে পূর্ণ চাঁদ তল তল ঢল ঢল করিতেছে - তাহার কাছেই - আকাশের একখানা কালমেঘ পড়িয়া ঘন ঘোর করিয়া তুলিয়াছে - মানুষের হৃদয়ের মত গঙ্গার হৃদয়েও যেন একই সঙ্গে হাসি কান্না গাঁথা রহিয়াছে, আর গঙ্গা হৃদয়ের হাসির সেই ছোট ছোত তরঙ্গ গুলিই যেন কুলকুল শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তট দেশ আঘাত করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মৃদুতর হইয়া গঙ্গার শোক সঙ্গীত যেন আমাদের কাণে পশিতে লাগিল। ওপারে মেঘের মত আবছা আবছা গাছপালার ভিতর একটি মাত্র আলো টিপ টিপ করিতেছে - এদিকে গাছ পালার ভিতর সন্ধ্যার তারা জ্বল জ্বল করিতেছে - আমার তীরে বসিয়া একটি কথা মনে হইতে লাগিল - একদিন এইরূপ জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর শোভা দেখিয়া একজন যে বলিয়া উঠিয়াছিল - "যদি মরিতে হয় ত এই সময় গঙ্গার বুকে -" আমার সেই কথাটি মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আমাদের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল, - আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই জ্যোৎস্নাধৌত চড়ার উপর বসিয়া বেড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম, - অবশেষে বাড়ী ফিরিলাম। এই খানেই আমাদের মন্দির দেখা শেষ নহে। আমরা এই মন্দির দেখার গল্প করিতেছি - একজন বলিলেন - গঙ্গার ওপারে পাড়িলা গ্রামে যে একটি শিবমন্দির আছে - বড় চমৎকার। শুনিয়াত আমার বন্ধুটি ক্ষেপিয়া উঠিলেন - যাইবার সব ঠিক ঠাক হইল - এবার যাত্রী আমরা ৪ জন স্ত্রীলোক - সঙ্গে দারোয়ান চাকর বাকর। ঘরের গাড়ী গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গেল, - তাহার পর গঙ্গার কাঁচা পুল ভাঙ্গিয়া উবড়ো খাবড়ো গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতে যাইবে, সে পথে কিছু আর ঘরের গাড়ী চলে না, - কাজেই এ দেশে খাঁচার মত ছোট ছোট যে একরূপ ঘোড়ার গাড়ী আছে, আমরা তাহার এক এক খানিতে দুইজন করিয়া চড়িলাম। একখানিতে আমি ও আমার তন্বাঙ্গী বন্ধুটি, আর একখানি কিছু অতিরিক্ত রকম জুড়িয়া গেল। মন্দির দেখার প্রসাদে আমাদের এক্কা চড়া পর্য্যন্ত হইয়া গেল, এক্কা চড়িয়া আমাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের দুইজনকে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে - দোল দিতে দিতে যখন পুল দিয়া এক্কাখান আয়েষে হেলিয়া দুলিয়া চলিল - আমার ত বড় মজার লাগিতে লাগিল, - আমরা দুজনে তখন প্রাণের যত সুখের গল্প করিতে বসিলাম, মনে হইতে লাগিল - সঙ্গীর গুণেই স্বর্গ-নরক, স্থানের গুণে নহে।

এইরূপ হাসিতে খুসিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পুলটা পার হইয়া গ্রাম্য কাঁচা রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সকলেরই মনে হইল - এইবার গম্য স্থানের কাছাকাছি আসা গেল - অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরে পৌঁছিব, ওমা - কোথায় কি? যতই যাই শুনি আরো যাইতে হইবে - পথের যেন আর শেষ নাই। চাকররা যারা সংগে ছিল তারা ঠিক পথ জানে না, - মাঝে মাঝে রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া তাহারা পথ জিজ্ঞাসা করে, - কেহ বলিয়া দেয় এ রাস্তায় যাও, কেহ বলে ওরাস্তায় যাও - পথের না আছে একটা ঠিক, না আছে একটা কথার ঠিক, - গাড়োয়ানেরা একবার এরাস্তায় একবার ওরাস্তায় গাড়ী দুটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে একটা মাঠের পথে আনিয়া ফেলিল - শুনিলাম এই পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে, - তখন বুঝিলাম - মহাদেবের মন্দিরে - কিন্তু তার পর দেখিলাম আর খনিকটা এইরূপ পথে চলিলে শীঘ্রই শেষ স্থানে যাওয়া যাইবে। মাঠের সেই পথহীন আঁকা বাঁকা ঢিবে ঢাবা উচু নীচু পথে বার বার স্বর্গ হইতে রসাতলে দুম দাম করিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ি চলিতে লাগিল। এক এক বার সমুখে একটা উঁচু ঢিবি দেখি কি করিয়া পার হইব প্রাণটা আঁতকাইয়া উঠে, আর গাড়ীটার দুই দিকে লোকেরা ধরিয়া মজেমে মজেমে (ধীরে ধীরে) করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে - কিন্তু অবশেষে দুম করিয়া নামাইয়া দেয় - মনে মনে বলি মজাটা যথেষ্ট হইয়াছে এখন একটু কমিলে বাঁচি। এইরূপ এক একটা ঢিবি পার হওয়া কলিকালের আর কি অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের গাড়ীটা তবু হালকি সওয়ারি, - দ্বিতীয় গাড়ীখানি এইরূপে পার করিতেছে। এক একবার লোকদেরো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় - যাত্রীদেরও ত্রাহি মধুসূদন হইয়া পড়ে, দুই একবার ত যাত্রী দুইটী গাড়ী হইতে নামিয়া উঁচু ঢিবি পার হইয়া লইলেন - তাঁহাদের মধ্যে একজনের ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল - তিনি আহার করিয়া শিব দর্শনে আসাতেই যত অনর্থ উৎপত্তি হইয়াছে, - আর কখনো এরূপ করিবেন না বলিয়া তিনি মাননা করিতে লাগিলেন। কোন রকমে যখন মাঠের সে ভবনদীটা পার হইয়া মন্দিরে আসা গেল - রমণী বলিলেন - তিনি মাননা না করিলে কখনই আজ মন্দিরে আসা ঘটিত না।

যাক্, এতটা সুখে রাস্তা পার হইয়া মন্দির দেখিয়া চক্ষুস্থির - একটা গলি ঘুঁজির মধ্যে একটা এঁদো পচা জায়গায় ছোট খাট একটা শিবের মন্দির, - এইত পাড়িলা মহাদেব। যাহক দুপুরের সময় বাড়ী ছাড়িয়া ৪টের সময় আমরা এখানে আসিয়া পৌঁহুছিলাম - ৪।। টের সময় আবার বাড়ী মুখো ফিরিলাম - অমন উঁচু নীচু পথে রাত হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে মাঠেই রাত কাটাইতে হইবে। সঙ্গে আবার একটা আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নাই, দুপুর রৌদ্রে বাড়ী ছাড়িয়া কার মনে অন্ধকার রাত্রের বিপদ মনে আসে? এবার সে রাস্তা না ধরে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ধরা গেল। শীতকাল, বিকাল হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়ে, সন্ধ্যা না আসিতে আসিতে অন্ধকার হয়, শীঘ্রই চারিদিক ঘোর ঘোর হইয়া আসিল - দৌড়াদৌড়ি তাড়াতাড়ি করিয়াও গাড়ী মাঠ না ছাড়াইতে ছাড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, বেচারা ঘোঁড়ারাই বা কত পারে, তবু তাহারা প্রাণ পণে চলিতে লাগিল, বাবলা গাছের নোয়ান ডালপালার কাঁটার আঁচড় খাইয়া, নীচে গাছগাছড়ার উপর তার প্রতিশোধ লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল - আর খানিকটা গেলেই গাড়ী মোহনগঞ্জের গ্রাম্য রাস্তায় আসিয়া পড়ে - সকলের

মনে এই মাত্র ভরসা; এই ভরসার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সেই মাঠের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলাম, ক্ষেত্রের মাঝে আঁধার গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, সহরের মত এখানে হিমের ধূঁয়া নাই - তাই সন্ধ্যাতেও একটু একটু চারিদিক নজরে পড়িতেছে। শীত কন কন করিতেছে - সজোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে - যেদিকে চাই ত্রিসীমায় একটা লোক নাই লোকালয় নাই একটা পথ দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা শেয়াল যা আমাদের দিকে তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছে। - যত অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল - হৃৎকম্প হইতে লাগিল, রাত্রি হইয়া গেলে আর কোন উপায় নাই - সমস্ত আমোদ প্রমোদ ফুরাইয়া গেল - সকলে নিঃঝুম হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার একবার মনে হইল নভেল লেখকগণ কেমন সহজে পথিককে দিক হারা করিয়া ফেলেন, কিন্তু দিকহারা অবস্থাটা যে কি ভয়ানক তাহা তাঁহাদের একবার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিই। যাহউক কোন জন্মের নিতান্ত পুণ্যবলে আমরা শীঘ্রই গ্রামের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, - আর ভাবনা রহিল না, বুঝা গেল যত রাত্রেই হৌক বাড়ী পৌঁছান যাইবে। তাহার পর যে বাড়ী ফিরিয়াছি তাহা আর বলার আবশ্যক নাই। এখন ঘরে বসিয়া সেদিনকার কথা মনে করিতে বড়ই লাগিতেছে ভাল, - মনে হইতেছে এত মন্দির দেখিয়াছি - এমন আমোদ কোথায় হয় নাই। একটা কথা, এত কষ্ট করিয়া কোথায় গঙ্গার পারে পাঁড়িলা মহাদেব তাহা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলাম আর আমাদের বাড়ীর কাছেই যে একটি ভাল মন্দির আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কখনো দেখা হইল না। যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহার আর কি এমনি হতাদর। এখানে আসিয়া আমরা গভর্ণমেন্ট হাউস, লাইব্রেরি, মেয়োহল, পার্ক প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিবার সব দেখিয়াছি কিন্তু কলিকাতায় যে এরূপ ধরণের কত ভাল ভাল বাড়ী উদ্যান আছে - তাহা দেখিবার কথা মনেও হয় না। এ বিষয়ে ঘরের ছেলের পাণ্ডিত্য আর বাসস্থান সমান। ঘরের ছেলে অন্য লোকের কাছে যখন মহা পণ্ডিত তখনও আপনাদের কাছে সে ঘরের ছেলে বই কিছুই নয়। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি - মানুষ করিয়াছি, চিরকাল যাহাকে আবল তাবল বকিতে শুনিয়াছি আঃ কপাল তিনি আজ আবার পণ্ডিত! সে পাণ্ডিত্য আবার চোখে লাগে!

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন - কলিকাতায় মনুমেন্টে চড়িয়াছ? অমুকস্থানে গিয়াছ ওমুকস্থান দেখিয়াছ? আমি ভাবি চিরকাল যাহার রক্তমাংসের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তাহাকে আবার নূতন আলাদা করিয়া কি দেখিব! কলিকাতাটা নাকি আবার একটা পদার্থ!

এখানে আর কি ইংরাজি প্রবার্বটা ঠিক খাটে Familiarity brings contempt -

এখানকার মেয়োহলটি মেয়োর স্মরণ চিহ্ন। ইহা বেশ সুদৃশ্য জমকালো একটি বাড়ী। কিন্তু ইহার প্রধান জিনিস ইহার স্তম্ভটি। ইহা কলিকাতার মনুমেন্টের মত অত উচ্চ না হউক - কিন্তু তবু বড় কম উচ্চ নহে - আমরা ত উঠিতে হিমঝিম খাইয়া গিয়াছিলাম, স্বর্গে উঠিতে গেলে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় - এই মঞ্চে উঠিবার সময় তাহার কতকটা আমাদের ধারণা হইয়াছে, - শেষদিকের সোজা সোজা উঁচু উঁচু ধাপগুলা এক একটা করিয়া উঠি আর মনে হয় - বুঝি আর পারিলাম না, বুঝি এইবার নামিতে হয়। যাহক অতদূর উঠিয়া আবার নামিয়া পড়া নেহাত অমানুষের কর্ম্ম - তাই জীবন মরণ পণ করিয়াও শেষে উঠিয়া পড়িলাম, উঠিয়া সমস্ত পথ শ্রান্তি নিমেষে ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল সত্যই স্বর্গে আসিয়াছি - চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য! নীচের গাছ পালার মধ্যে ঘর বাড়ী সব একসা হইয়া গিয়াছে - বড় বড় স্তম্ভ ছোট ছোট ডাণ্ডার মত হইয়া পড়িয়াছে - মানুষগুলো পোকার মত কিলবিল করিয়া চলিতেছে - চারিদিকে একটা সীমা হীন দৃশ্য; দিগন্তের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে - ছোটর সহিত বড় মিলিয়াছে - এই খানে দাঁড়াইয়া দেখিলা মনে হয় সংসার যেন একটা ছেলে খেলা, যেন একটা পুতুলের রাজ্য, আকাশ গম্বুজে আসীন আক মহান পুরুষ সেই পুতুলদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছেন। উঠিতে এত কষ্ট নামিতে কিছুই না! আমরা যখন নামিয়া আসিলাম দেখিলাম পশ্চিমের লাল আলো না মিশাইতে চাঁদ উঠিয়াছে, বিকাল না ফুরাইতে সন্ধ্যা হইয়াছে - বিকালের লাল আলো আর চন্দ্রমাশালিনী সন্ধ্যার রজত আলো একত্র মিশিয়াছে, কলিকাতায় কখনো এমন সন্ধ্যা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

[অভ্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি

হেমকুণ্ডের পথে

সুবীর কুমার রায়

আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা, কেন জানিনা হঠাৎ আমার মনে হিমালয়, বিশেষ করে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গঙ্গোত্রী, গোমুখ আর যমুনোত্রী দেখার ঝোঁক চেপে বসে। তখন না ছিল সঙ্গী, না ছিল সামর্থ্য। এর কিছু পরে শঙ্কু মহারাজের বিখ্যাত কাহিনিটি অবলম্বনে নির্মিত "জাহ্নবী যমুনা, বিগলিত করুণা" সিনেমা দেখে, আমার এই ঝোঁক যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। এরও বেশ কিছুদিন পরে, ১৯৭৭ সালে আমার প্রথম হিমালয় দর্শনের সুযোগ ঘটে। অবশ্য গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী নয়। সুযোগ আসে নৈনিতাল, রানীক্ষেত, আলমোড়া, কৌশানি, গোয়ালদাম ইত্যাদি জায়গা দেখার। সেই দিনগুলোর কথা আজও ভুলতে পারি নি। চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর - বহুদূরে ত্রিশুল, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, প্রভৃতি বরফে ঢাকা শৃঙ্গ, চোখ জুড়ানো সূর্যোদয়। তবু মনে হয়েছিল আমার কল্পনার সঙ্গে যেন মোটেই মিল নেই। কোথায় সেই বন্ধুর পথ? কোথায় চটিতে রাত্রিবাস? তবু হিমালয়কে অনেক কাছ থেকে বাস্তবে পেয়ে, পূর্বের ঝোঁক যেন আবার নতুন করে প্রাণ লাভ করলো। সময়, সুযোগ, সঙ্গীর প্রতীক্ষা করে থাকলাম। পরের বছরেই সুযোগ এসে গেল। কিন্তু সঙ্গে বাবা-মা থাকায়, সে ইচ্ছাকে সাময়িক ভাবে ঘুম পাড়িয়ে, আমরা দেখলাম হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী, হৃষিকেশ। সেটা ছিল সারা দেশ জুড়ে বন্যা প্লাবিত ১৯৭৮ সালের নভেম্বরের শেষ। মুসৌরীর লাল টিব্বার ওপর থেকে জাপানী দূরবীক্ষণে, দূরের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদ্রীনারায়ণকে কাছে বরফ ঢাকা অবস্থায় পেলাম। তার ওপর আবার হৃষিকেশে কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীগামী বাসগুলোকে আমাদের ফেলে চলে যেতে দেখে, মনটা হুহু করে উঠলো। ঠিক করলাম আর নয়, সামনের বছর যেতেই হবে।

আমার প্রত্যেকবারের ভ্রমণসঙ্গী, মাধব ব্যানার্জীকে সঙ্গে নিয়ে দিনক্ষণ স্থির করে ফেললাম। সঙ্গী হল আরও একজন, দিলীপ পাল। স্থির হল প্রথমে যাব যমুনোত্রী, তারপর গঙ্গোত্রী-গোমুখ, এরপর কেদারনাথ, সব শেষে নন্দন কানন, হেমকুণ্ড হয়ে বদ্রীনারায়ণ। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। দিন আর কাটে না। ক্রমে ক্রমে দিনটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা হল। স্থির হল তেরই আগষ্ট, ১৯৭৯ সাল। উত্তর প্রদেশ টুরিষ্ট বিভাগ আমাদের পরামর্শ দিল প্রথমে নন্দন কানন যেতে, কারণ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে নন্দন কাননের সমস্ত ফুল ঝরে যেতে শুরু করবে। কাজেই আমাদের পূর্ব পরিকল্পনাকে ঠিক উল্টো করে, রাস্তা ঠিক করলাম। স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ও নতুন তথ্য পেলাম, যা উত্তরপ্রদেশ টুরিষ্ট বিভাগেরও অজানা। যাহোক, নির্দিষ্ট সময়ে আমরা দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বারের তিনটে টিকিট কাটলাম। হান্টার স্যু, পলিথিন সিট, ওয়াটার প্রুফ, ওয়াটার বটল ইত্যাদি কেনাকাটাও করে নিলাম। প্রস্তুত হলাম শুভদিনের শুভক্ষণের জন্য।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৯ সাল। আমরা তিনজন মালপত্র নিয়ে দুন এক্সপ্রেসে নিজেদের আসন দখল করলাম। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রেডিওর খবরে হরিদ্বারে জলবৃদ্ধির সংবাদও অনেক আগেই পেয়েছি। তাই মনটা অস্থির ও খারাপ হয়েই ছিল। রাত ন'টা ত্রিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়তে, কেন জানিনা, আস্তে আস্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর হয়ে গেল। আসন্ন যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলাম। রাস্তায় ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গানো সম্ভব নয়। তাই সমস্ত টাকা পয়সা নগদ সঙ্গে থাকায় আর এক চিন্তা।

পনেরই আগষ্ট সকালে হরিদ্বার পৌঁছলাম। ট্রেন থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নেমে দেখি, চারদিক ঘন কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। বাসস্ট্যাণ্ড কিছুটা দূরে, শেয়ার ট্যাক্সিতে জায়গা করে নিলাম। বৃষ্টিতে ট্যাক্সির কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার চারদিকে বড় বড় গর্ত হয়ে আছে। গঙ্গার ধারে, রাস্তার পাশে, একটা অয়েল ট্যাঙ্কার কাত হয়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ করে রেখেছে। দূরের পাহাড় ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে। সব কিছু মিলে গোটা পরিবেশটাই একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বুঝতে পারছি আমাদের কপালেও দুঃখ আছে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ট্যাক্সি কালীকম্বলী ধর্মশালার কাছে আমাদের ছেড়ে দিল। একুশ টাকা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, গুটিগুটি পায়ে বৃষ্টিতে ভিজে ধর্মশালায় পৌঁছলাম। ধর্মশালার নতুন বাড়িটা বেশ ভাল। সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু কী কারণে জানিনা, কর্তৃপক্ষ আমাদের নতুন বাড়িতে স্থান দিতে সম্মত হ'লেন না। স্থানীয় একজনের বাড়িতে আঠারো টাকা ভাড়া দিয়ে একখানা ঘর ঠিক করলাম। ভদ্রলোক আমাদের বাঙালিবাবু বলে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা ডিম খাবেন? আমার কাছে ডিম পাবেন'। আশ্চর্য হয়ে গেলাম!

যাহোক, বাইরে কিছু চা-জলখাবার খেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ভদ্রলোক আবার খোঁজ করলেন আমাদের কিছু প্রয়োজন আছে কী না। আমরা না বললেও নাছোড়বান্দাভাবে বললেন, "এ বাড়ি আপনাদেরই নিজেদের বাড়ি বলে মনে করবেন। কোন রকম অসুবিধা হলেই আমাকে জানাবেন"। খানিক পরে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে জানতে পারলাম যে, বেলা দু'টোয় বদ্রীনারায়ণগামী বাস ছাড়বে এবং সেটা সন্ধ্যায় শ্রীনগরে হল্ট করবে। সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মালপত্র গোছগাছ করতে লেগে গেলাম। প্রত্যেকটা হোল্ড-অল এর ভিতরে কম্বলগুলো পলিথিন সীট দিয়ে মুড়ে নিলাম। হোল্ড-অলটাও একটা পলিথিন কভারে পুরে ফেললাম। বৃষ্টিতে কম্বল ভিজবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকলো না। সব সময় প্রয়োজন হতে পারে, এমন সমস্ত জিনিস, সামান্য করে শুকনো খাবার, চিকলেটস্ ইত্যাদি একটা সুটকেসে নিয়ে, সমস্ত জিনিস অন্য সুটকেস দু'টোয় ভরে নিলাম। টাকার হিসাব করতে গিয়ে মহা বিপদ হল। একটা পাঁচ টাকার প্যাকেট, অর্থাৎ পাঁচশ' টাকা, কোথাও খুঁজে পেলাম না। আবার সমস্ত সুটকেস ঘেঁটে, শেষ পর্যন্ত একটা ওয়াটার প্রুফের ভেতর সেটাকে পাওয়া গেল। চটপট তিনজনে স্নান সেরে নিলাম। জানিনা কবে আবার এ সুযোগ পাব। মালপত্র ঘরেই রেখে, দুপুরের খাবার খেতে গেলাম। কিছুক্ষণ আগেই চা-জলখাবার খাওয়ায় খিদে নেই, তবু সামান্য কিছু ভাত, ডাল, তরকারি একটা পাঞ্জাবি হোটেলে খেয়ে নিলাম। মনে মনে স্থির করলাম,

এরপর থেকে সব জায়গায় রুটি খাব। ভাত খেলে বড্ড ঘুম পায় আর হাঁটতেও কষ্ট হয়।
খাওয়া সেরে গেলাম বাসের টিকিট কাউন্টারে। আমাদের সামনে একজন পাঞ্জাবি সাধু পাঁচটা গোবিন্দঘাটের টিকিট কাটলেন। আমাদেরও ওখানকারই টিকিট প্রয়োজন। গোবিন্দঘাট থেকেই নন্দনকানন ও হেমকুণ্ড যাওয়ার হাঁটা পথের শুরু। মোটামুটি খোঁজখবর নিয়ে আমরা তিনটে গোবিন্দঘাটের টিকিট কাটলাম। ভাড়া লাগলো পঁচাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সামনের রাস্তা আমাদের সকলেরই অজানা। গাইড ম্যাপ ও কিছু লোকের মুখের কথার ওপর আমাদের সমস্ত ট্যুরটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। নিজেদেরও এই জাতীয় ভ্রমণ, এই প্রথম। তাই বোধহয় একটু অস্বস্তিও হচ্ছিল। ঘরে ফিরে এসে সমস্ত মালপত্র নিয়ে বাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে আমাদের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে বললাম, 'বাসের টিকিট পেয়ে গেলাম, তাই আর অপেক্ষা না করে আমরা চলে যাচ্ছি। আপনি যদি ভাড়ার ব্যাপারটা একটু কনসিডার করেন, তাহলে খুব উপকার হয়'। যে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগেও আমাদের বলেছিলেন, এ বাড়িটা নাকি আমাদেরই, তিনিই এখন বললেন, 'এটাতো হোটেল, তাই একঘন্টা বা একদিনের একই ভাড়া।' বললাম, 'জোর কিছু নেই, তবে আমরা আবার হৃষিকেশেই ফিরে আসবো এবং কয়েকদিন এখানে থেকে বিশ্রাম নেব।' তবু কোন লাভ হ'ল না, পুরো ভাড়াই দিতে হ'ল।
দিলীপকে বাসে চাপিয়ে, সামনের দিকে দু'টো শিট রেখে, মালপত্র সব বাসের ছাদে তুলে, আমি আর মাধব গেলাম পয়েন্টেড লাঠি কিনতে। ওটা সঙ্গে থাকলে হাঁটার কষ্ট অনেক কম হবে। তিনটে ভাল লাঠি ছ'টাকা দিয়ে কিনে, বাসে ফিরে এসে জায়গা দখল করে বসলাম। আরও আধঘন্টা পরে বাস ছাড়ার কথা। সময় আর কাটে না। আমাদের সামনে দু'টো করে দু'দিকে শিট আছে। সেগুলো সমস্ত পাঞ্জাবি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দ্বারা অধিকৃত। একবারে সামনে, ড্রাইভারের বাঁপাশে একটা সিঙ্গল সিটে, সেই পাঞ্জাবি সাধুবাবা বসে আছেন। বাকী সমস্ত পাঞ্জাবিরা তাঁকে খুব সম্মান দেখাচ্ছেন, তাঁর সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আমাদের ঠিক পিছনেই মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা একটা দল, যাবে বদ্রীনারায়ণ। পিছনে ডানদিকে উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন আছে। বাদবাকীর খবর জানতে পারলাম না। বাস থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে, নিজেদের মন ও শরীরকে একটু চাঙ্গা করে নিলাম। উত্তেজনায় বারবার জল পিপাসা পাচ্ছে। বাসে ফিরে এসে জানলার ধারে বসে রইলাম।
পৌনে দু'টো নাগাদ বাস ছেড়ে দিল। অনেকদিনের স্বপ্নপূরণের সূচনার সেই মুহূর্তের কথা ঠিক বোঝাতে পারবো না। ক্রমে লছমনঝোলা পুলকে ডানপাশে রেখে, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন দৃশ্যকে পিছনে ফেলে বাস এগিয়ে চললো। অনেকেই জোর গলায় ভগবানের নাম করতে লাগলেন। আমার পাশে মাধব, অপরদিকে জানালার ধারে দিলীপ। যত ভাল ভাল দৃশ্য, সব যেন ওর দিকেই রয়েছে! ওর পাশে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক। তিনি এই পথের নানা জায়গা, বা নিকটবর্তী জায়গা সম্বন্ধে দিলীপকে নানা কথা বলছেন।
ক্রমে দেবপ্রয়াগ পেরোলাম। খুব সুন্দর জায়গা। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছলাম গাড়োয়ালের রাজধানী, পাহাড়ি শহর শ্রীনগর। সামনেই একটা ছোট হোটেলে রাতে থাকবার কথা বলতে, হোটেল মালিক এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন। তিনি ঘরের ভিতরে মালপত্র রেখে, আমাদের রাস্তার পাশে বারান্দায়, খাটিয়ায় শোবার ব্যবস্থা করতে বললেন। কী করবো ভাবছি। সমস্ত পাঞ্জাবিরা চলে গেছে সামনের গুরুদ্বোয়ারায়। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা বাঙালি কীনা। ভদ্রলোক স্থানীয়, কেদারনাথের পথে ট্রান্সপোর্টে কাজ করেন। আমরা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে জানালাম হাওড়ায় থাকি। ভদ্রলোক বললেন তিনি কালীকম্বলী ধর্মশালায় আজ রাতটা থাকবেন, আমরা ইচ্ছা করলে ওখানেই থাকতে পারি। চেনা চেনা লাগছিল, এবারে মনে পড়ল, ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে একই বাসে এসেছেন, যাবেন শ্রীনগর ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে। ধর্মশালায় আমাদের তিনজনকে প্রথমে থাকতে দিতে সম্মত হ'ল না। ভদ্রলোককে একটা ঘর অবশ্য দিয়ে দিল। শেষে ওঁর বারংবার অনুরোধে, আমাদেরও একটা ঘর ধর্মশালা কর্তৃপক্ষ দিতে রাজি হ'লেন। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাতে বললেন, তিনি বাঙালিদের খুব পছন্দ করেন, সাহায্য করতে চেষ্টা করেন, কারণ একসময় মাস ছয়-সাতেক কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনে, নিজেদের খুব ছোট মনে হ'ল। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে করে সমস্ত শ্রীনগর শহর ঘুরে দেখালেন। সন্ধ্যার শ্রীনগর বড় সুন্দর। সেদিন আবার স্বাধীনতা দিবস। অনেক জায়গা নানাভাবে সাজানো হয়েছে।

ষোলই আগষ্ট। ভোরবেলা তৈরি হয়ে মালপত্র নিয়ে বাসে উঠলাম। নিজেদের সিটে বসতে, পাঞ্জাবি সাধুবাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা গতকাল কেন তাঁদের সঙ্গে গুরুদ্বোয়ারাতে থাকলাম না? বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার অসুবিধার জন্যই কি? গুরুদ্বোয়ারায় ধুমপান নিষেধ। আমি কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে বললাম যে, তাঁদের সঙ্গে অনেক লোক, গুরুদ্বোয়ারায় হয়তো জায়গা হবে না। তাই আমরা ওখানে না গিয়ে অন্যত্র উঠেছিলাম। সাধুবাবা বললেন, যত লোকই আসুক, গুরুদ্বোয়ারায় জায়গা হবেই, খাওয়ার ব্যবস্থাও হবে। আমাদের ধারণা ভুল। বললাম এরপর থেকে তাঁদের সঙ্গে গুরুদ্বোয়ারাতেই থাকবো। বলবার একমাত্র কারণ, গোবিন্দঘাটে একটা গুরুদ্বোয়ারা ছাড়া, কোন হোটেল বা থাকবার জায়গা নেই বলেই জেনেছিলাম। এঁরা অসন্তুষ্ট হলে যদি সেখানে স্থান না পাই? আমরাও তাঁকে একটু আলাদা সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে বাস থেকে নেমে, চা জলখাবার খেয়ে নিয়ে, জায়গাটা এক চক্করে দেখে নিলাম। খুব সুন্দর লাগল, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদী এখানে মিশেছে। তবে একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিল। জিম করবেট-এর 'রুদ্রপ্রয়াগের চিতা' পড়েছি। কত বছর আগেকার ঘটনা। জায়গাটা এখনই এই, তাহলে তখন কী ছিল! করবেট সাহিব কীভাবে ওইরকম একটা হিংস্র চিতাকে এখানে মেরেছিলেন, ভাবতেও অবাক লাগছিল।
ক্রমে গৌচর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ অতিক্রম করে আমাদের বাস এগিয়ে চললো। শেষে চামোলী নামে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে ধ্বস নেমেছে। একটা বুলডোজার দেখলাম রাস্তা পরিস্কারের জন্য প্রস্তুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা পরিস্কার হয়ে যাওয়ায়, বাস আবার ছাড়লো। কণ্ডাক্টারের কাছে জানতে পারলাম সামনেই পিপলকোঠি, ওখানেই দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ঠিক সময়ে বাস এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালে চটপট বাস থেকে নেমে, সামনেই একটা ছোট্ট হোটেলে রুটি তরকারির অর্ডার দিলাম। একটু পরেই আমাদের বাসের পাঞ্জাবিরা এসে ওই হোটেলে জায়গা করে নিল। একসঙ্গে অত খদ্দের পেয়ে, দোকানদার আমাদের ভুলে গিয়ে তাদের আগে খাবার পরিবেশন করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেষে বিরক্ত হয়ে অন্য একটা ছোট হোটেলে রুটি, সবজি আর টক দই খেয়ে নিয়ে বাসে ফিরে এলাম। সামান্য এগিয়েই বাস আবার থেমে গেল। বুঝলাম আবার পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে। দেখলাম দশ-বার বছরের কয়েকটা বাচ্চা ছেলে রাস্তা পরিস্কার করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা রাস্তা পরিস্কার করে ফেলল দেখে বেশ আশ্চর্যই হলাম।
কিন্তু আমাদের কপাল সত্যিই খুব খারাপ। খানিক এগিয়ে দূর থেকেই দেখি বাস, জীপ, ট্রাক সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের বাস অনেকগুলো

গাড়িকে কাটিয়ে, একবারে সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। শুনলাম সামনে এমন ধ্বস নেমেছে যে হেঁটেও যাওয়া সম্ভব নয়। ঘড়িতে দুপুর দু'টো। একটা বাঁক পেরিয়েই দেখতে পেলাম ওপর থেকে বিরাট বড় বড় পাথর রাস্তার ওপর পড়ে, রাস্তাকে নিয়ে তলায় চলে গেছে। একজন পাঞ্জাবি মিলিটারির তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু বাচ্চা ছেলে রাস্তা পরিস্কারের কাজ করছে। ধ্বসটার অপর দিকে হেলং নামে একটা শহর। ধ্বসের ওপারে কতগুলো বাস দাঁড়িয়ে আছে জানিনা, তবে আমাদের এদিকে বাস, জীপ ও ট্রাক মিলে প্রায় চল্লিশটা গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাসের আমরা তিনজন ও কয়েকজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, ওই মিলিটারিটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কাজে হাত লাগাবো কিনা। কিন্তু কেন জানিনা, আমাদের কোন কাজে হাত লাগাতে দেওয়া হ'ল না।

আসবার পথে অনেক ঝরনা চোখে পড়ছিল। ভাবলাম এই ফাঁকে আমাদের তিনটে ওয়াটার বটল ভরে নিয়ে আসি। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে কোন ঝরনাই নেই। অনেক লোক বালতি, হাঁড়ি, ডেকচি নিয়ে জলের খোঁজে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, একটা পাথর জলে ভিজে রয়েছে। খুব সরু একটা জলের ধারা পাথরটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় পড়ছে। একজন পাথরটার ওপর একটা গাছের পাতা এমন ভাবে পেতে দিল, যে ওই জলধারা পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে না পড়ে, পাতার ডগা দিয়ে টপটপ করে পড়তে শুরু করল। সেই পাতা থেকে নিজেদের বালতি, হাঁড়ি ভরে নেবার জন্য অনেক লোকের ভিড়। আমি এগিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললাম, 'এত লোক, আর এই সামান্য জল। প্রত্যেকে অল্প অল্প করে নাও'। আমার জামাকাপড় একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আর চেহারা-চালচলন শহুরে বলেই বোধহয়, ওরা আমাকে আগে জল নিতে দিল। বাস আজ আর ছাড়বার আশা খুবই কম। সঙ্গে খাবার বলতে এক শুকনো চিঁড়ে আছে। ফলে জল অনেক বেশি করেই প্রয়োজন। আমার ওয়াটার বটল ভর্তি হয়ে গেলে, স্বার্থপরের মত দেখালেও দিলীপ আর মাধবকেও ভরে নিতে বললাম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। অনবরত ডিনামাইট দিয়ে পাথর ভেঙ্গে রাস্তা পরিস্কারের কাজ চলছে। এরমধ্যে ঠিক হ'ল, এদিকের যাত্রীদের ওদিকের বাস নিয়ে যাবে, ওদিকের যাত্রীদের এদিকের বাস। একটা আশার আলো দেখা গেল। কিন্তু সমস্যা হ'ল, এই রাস্তায় তিন-চার রকম কোম্পানীর বাস চলে। একই কোম্পানীর বাস দু'দিকে থাকলে, তবেই এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা এ সুযোগ পেলাম না। বেশ কিছু যাত্রী মালপত্র নিয়ে এপার-ওপার করতে আরম্ভ করে দিল। ফলে রাস্তা পরিস্কারের কাজে বিলম্ব হতে শুরু করলো। শেষে মিলিটারি ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন, আজ আর কাজ করা সম্ভব নয়। আকাশও কালো মেঘে ঢেকে গেছে। ড্রাইভার বাসের যাত্রীদের বলল, পিছনে তিন কিলোমিটার দূরে 'লংসী' নামে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। ওখানে গেলে রাতে থাকার ও খাওয়র ব্যবস্থা করা যাবে। এ রাস্তায় রাতে বাসে থাকার নিয়ম নেই, উচিতও নয়। খবরটা শুনে বাসের সব যাত্রীই খুব খুশি।

বাসটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কথামতো লংসী গ্রামে আসা হ'ল। রাস্তায় দু'টো বড় ও একটা ছোট ঝরনা দেখলাম। গ্রাম মানে দু'টো ছোট চায়ের দোকান। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো কিছু জনবসতি থাকতেও পারে। একটা দোকানে চা আর পকোড়া খেয়ে নিলাম। বুঝলাম খিদে পেলে ঠাণ্ডা ন্যাতন্যাতে পকোড়াও কত উপাদেয় হয়। যাহোক, পনের টাকা ভাড়ায়, একটা মাত্র ঘর পাওয়া গেল। সে ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, বাসের অর্ধেক লোকের জায়গা হবে না। ফলে কেউই থাকতে রাজি হল না। ঠিক হল সবাই রাস্তায় ও বাসেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। বুঝতে পারছি বিপদে পড়ে আমরা কখন যেন একই পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছি।

বাসের কাছে ফিরে এসে দেখি, তিনজন পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলা ও একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, বাসের পাশে বড় একটা পলিথিন শিট পেতে শুয়ে আছেন। ওই পরিবারের একজনের সঙ্গে বেশ আলাপ হ'ল, নাম তীরথ সিং। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালায় কাজ করে, পাতিয়ালাতেই থাকে। তার সঙ্গে এই যাত্রায় মা, বোন, ও ভগ্নীপতি আছে। যাবে হেমকুণ্ড সাহিব। আমরা হেমকুণ্ড আর নন্দনকানন যাব বললাম। তীরথ জানালো তার খুব নন্দনকানন দেখবার ইচ্ছা। কিন্তু আর সব পাঞ্জাবিরা হেমকুণ্ড দেখে ফিরে আসবে। আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে যাবার সুযোগ দিলে, তার ইচ্ছাপূরণ হয়। মা, বোন ও অসুস্থ ভগ্নীপতি ঘাঙরিয়াতে গুরুদ্বোয়ারায় থাকবেন। আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামলো। বেশ জোরেই হচ্ছে। বাসের সবার খাওয়া হয়ে গেছে। আমরাও পুরি- তরকারি খেয়ে ছুটে বাসে ফিরে এলাম। ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা নেই। কালও যাওয়া হবে কীনা সন্দেহ। মহিলারা দিব্যি ম্যানেজ করে বাসের মেঝেতে বা তিনজনের জন্য বসার পিছনের দিকের সিটে শুয়ে পড়েছে। আমি আর মাধব আমাদের নিজেদের সিটে বসে। দিলীপ অপর দিকে তার নিজের সিটে। একটু কাত হব তার উপায় পর্যন্ত নেই। বোধহয় একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি আমার হান্টার স্যু পরা শ্রীচরণদুটো সামনের সিটের পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলার পেটের ওপর। তাড়াতাড়ি আবার সোজা হয়ে বসলাম। সব কিছুরই একটা শেষ আছে। রাত্রিও ক্রমে শেষ হয়ে ভোর হয়ে এল।

ভোরের আলোয় দেখলাম, জায়গাটা খুব সুন্দর। অদ্ভুত একটা বেগুনী রঙের চার পাপড়ির ফুল, চারিদিকে ফুটে আছে। অনেকটা প্রজাপতির মতো দেখতে। এর আগে সমস্ত রাস্তায় হালকা বেগুনী দোপাটির মতো একরকম ফুল দেখে আসছিলাম। এখানে সে ফুল দেখছি না। একটা মিলিটারি ভাঙ্গাচোরা জীপকে একটা মিলিটারি ট্রাক টেনে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। দিন দু'এক আগে নাকি একটা বাসের সাথে ধাক্কায়, জীপটার এই হাল হয়েছে। বাসের সামনের চাকা জীপের ছাদে উঠে গিয়ে আটকে যাওয়ায়, গভীর খাদে পড়া থেকে রক্ষা পায়। জীপের ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে গেলেও, বিশেষ কোন আঘাত পায় নি।

সকাল ন'টার সময় আমরা দোকানটায় খাবার খেতে গেলে, দোকানদার জানালো, পুরি আর তরকারি পাওয়া যাবে। আটা মাখার সময় লক্ষ্য করলাম, অজস্র সাদা রঙের ছোট্ট ছোট্ট পোকা, আটার মধ্যে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকটা শুঁয়ো ছাড়া, বাচ্চা শুঁয়োপোকার মতো দেখতে। দু'চারটে আটা থেকে বেছে বেছে বাইরে ফেলে বুঝলাম, বৃথা চেষ্টা করছি। আটার থেকে সম্ভবত পোকার পরিমাণ বেশি। উঠে এলাম ওখান থেকে। পুরি তৈরি হলে গরম "আমিষ পুরি", তরকারী সহযোগে খেতে বাধ্য হলাম। খাবারের দাম দেওয়ার সময় দোকানদার আমাদের কাছে দাম নিতে চাইল না, কারণ আমরা নাকি কিছুই খাই নি। সে বলল, এত অল্প খাবারের জন্য আর কী দাম নেব? দাম দিতে হবে না। তাকে জোর করে দাম দিয়ে ভাবলাম, আমরা ভারতবর্ষেই আছি তো!

যাহোক, বেলা দশটা নাগাদ, আমরা আবার সেই ধ্বসের কাছে এলাম। ড্রাইভারের দক্ষতায় এবারও আমরা প্রায় সবার আগেই। চারদিকে মহিলারা স্টোভে খাবার তৈরি করছে। এরা সমস্ত রাত এখানেই ছিল। মাত্র দু'টাকা কিলোগ্রাম দরে একরকম স্থানীয় আপেল, রাস্তার পাশে পাশে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। কিছুটা সংগ্রহ করে রাখলাম। খুব হাল্কা বৃষ্টি আরম্ভ হল। আজ কিন্তু কালকের সেই মিলিটারি পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, আমাদের রাস্তা পরিস্কারের কাজে হাত লাগাতে অনুমতি দিলেন। শুরু হল বৃষ্টিতে ভিজে খাদে পাথর ঠেলে ফেলা। রাস্তা থেকে ঠেলে ফেলা পাথর, তলায় অনেক নীচে নদীতে গড়িয়ে পড়ছে। উঃ, সে কী ভয়ঙ্কর শব্দ। এখানেই দেখলাম তীরথ সিং এর ক্ষমতা। আমরা সবাই কাজ করছি, তবু তার ক্ষমতার তুলনা হয় না। একটা শাবল দিয়ে পাথর ভেঙ্গে, একা খাদে ঠেলে ফেলছে। বেলচা দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করছে। মাঝে মাঝে ডিনামাইট দিয়ে বড় বড় পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। লম্বাটে গোলাকার ধূপকাঠির প্যাকেটের মতো পাঁচ-সাতটা জিনিস একসঙ্গে তার দিয়ে জড়িয়ে বড় বড় পাথরের ওপর রেখে পাহাড়ের ধার থেকে ভিজে মাটি নিয়ে তার ওপর ভাল করে চাপা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। এরকম অনেকগুলো বাণ্ডিল বিভিন্ন বড় বড় পাথরের ওপর রেখে, প্রত্যেকটার সঙ্গে তার যোগ করে, বেশ কিছুটা দূর থেকে ওই মিলিটারি পাঞ্জাবি ভদ্রলোক ওগুলোকে ব্লাস্ট করাচ্ছেন। কী ভাবে ভদ্রলোক ব্লাস্ট করাচ্ছেন দেখার খুব ইচ্ছা থাকলেও, তাঁর নির্দেশে অনেক দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। একটু পরে দেখি তিনি বাঁশি বাজিয়ে আমাদের আরও দূরে চলে যেতে বলে, নিজেও

দৌড়ে অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে খাদের ওপারের পাহাড় থেকে বিকট একটা বোমা ফাটার আওয়াজ হল। চমকে উঠতেই, আমাদের ঠিক পাশে উঁচু পাহাড়টা থেকে আবার সেই আওয়াজ। মনে হল খাদে পরে যাব। সঙ্গে সঙ্গে আবার খাদের ওপার থেকে আওয়াজ। এইভাবে বেশ কয়েকবার প্রতিধ্বনি হয়ে সব নীরব। যাহোক, ডিনামাইট দিয়ে ব্লাষ্ট করাবার পরে আমরা এগিয়ে এসে আবার সেই ভাঙ্গা পাথর তলায় ফেলছি। যত তাড়াতাড়ি রাস্তা পরিস্কার হবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি পাব। বৃষ্টি আবার বেশ জোরে নামলো। আমরা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেদের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। জামাপ্যান্ট ভিজছে, তবে খুব অল্প। তীরথ কিন্তু বৃষ্টিতেও কাজ করে গেল। মুশকিল হ'ল, পাথর যত তলায় ঠেলে ফেলা হচ্ছে, সেগুলো তত ভাঙ্গা রাস্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তলায় নামছে। ফলে ওই জায়গায় রাস্তা আরও সরু হচ্ছে। এবার একজন স্থানীয় ছেলে খাদের দিকে কিছুটা নেমে, ভাঙ্গা রাস্তার খাদের দিকটায়, কী অদ্ভুত কায়দায় পাথরের দেওয়াল তৈরি করে দিল। এটাকে এখানকার লোকেরা দেখলাম "পাক্কা রাস্তা" বলে। রাস্তা একটু পরিস্কার হতে, ধ্বসের ওদিক থেকে গোটা দু'তিন মোটর সাইকেল, এপারে আমাদের দিকে চলে এল। প্রতি মোটর সাইকেলে দু'জন করে যুবক যাত্রী, হাতে এক গোছা ফুল। শুনলাম এগুলোই নাকি ব্রহ্মকমল। কী আনন্দই যে হল, আমরা তাহলে ফুলের দেশে প্রায় এসে গেছি।

শেষ পর্যন্ত বিকেল সাড়ে চারটের সময়, আমাদের দিক থেকে প্রথম একটা মিলিটারি জীপ ওপারে গিয়ে রাস্তা উদ্বোধন করলো। তারপর সমস্ত যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে একে একে সব ফাঁকা বাস খুব ধীর গতিতে ধ্বসের ওপারে চলে গেল। ওপারে গিয়ে দেখি, ওদিকের যাত্রীদেরও করুণ অবস্থা। তাদের আগে ছাড়া হয়নি বলে তাদের খুব দুঃখ। তবে এদের গতকাল রাতে খাবার জুটেছে, কারণ সামনেই দু'একটা দোকান আছে।

বাসে উঠে বসলাম। পাঞ্জাবিরা আমাদের খুব প্রশংসা করছে। সবাইকে বলছে যে আমরা রাস্তা পরিস্কারের জন্য খুব কাজ করেছি। এরপর থেকে আমাদের তিনজনকেও তাদের দলভুক্ত করে ফেলল। বিশেষ করে সেই তীরথ সিং। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছলাম যোশীমঠ। আজ বাস আর যাবে না, কারণ কোনমতেই রাতের আগে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছতে পারবে না। মাঝপথে যদিও গোবিন্দঘাট, কিন্তু সেখানে রাত্রে থাকার জায়গার অভাব, তাই যোশীমঠেই থাকতে হল। চারদিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।

পাঞ্জাবিদের সাথে মালপত্র নিয়ে গুরুদ্বোয়ারায় উঠলাম।

পাশেই বিড়লা গেষ্ট হাউস। অজস্র ফুল ফুটে আছে। থাকার জায়গাও আছে, চার্জও খুব একটা বেশি নয়। তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওদের সাথে গুরুদ্বোয়ারায় গেলাম। মাঝখানে উপাসনা কক্ষ। সাধুবাবা তীরথের গেষ্ট, তার সঙ্গেই এসেছেন। তিনি আমাদের জায়গা করে নিতে বললেন। ওদের পাশেই হোল্ড-অলগুলো খুলে তিনজনের শোয়ার ব্যবস্থা করে নিলাম। মাথা থেকে টুপি খুলতে গেলে তীরথ জানালো, গুরুদ্বোয়ারায় খালি মাথায় থাকতে নেই। আমরা রাস্তায় এসে চা জলখাবার খেয়ে, একটু ঘুরে বেড়ালাম। কুয়াশায় জামাপ্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে গুরুদ্বোয়ারায় ফিরে এলাম। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। একটু পরে উপাসনা ঘরে প্রার্থনা শুরু হল। "শতনাম এ হ্যায় গুরু", আর সকলের সাথে প্রার্থনা ঘরে আমরাও সুর করে গাইলাম। প্রার্থনা শেষে সামান্য সুজি প্রসাদ পেলাম। তীরথের মা, বোন এবং আর সব মহিলারা গেলেন সবার জন্য রুটি বানাতে। একসময় ডাক এলে আমরাও একসঙ্গে খেতে গেলাম। খোলা আকাশের নীচে লম্বা শতরঞ্চি পাতা। একটা কল থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল পরছে। হাত ধুয়ে বসে পড়লাম। হাল্কা ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা সকলে বৃষ্টিতে বসে আছি। একটু দূরেই রুটি তৈরির কাজ জোর কদমে চলছে। এবার কয়েকজন পাঞ্জাবি খাবার পরিবেশন করা শুরু করলো। বিরাট বিরাট থালা প্রত্যেকের সামনে রেখে দিয়ে যাওয়া হ'ল। এক পাত্র করে ডাল থালায় ঢেলে দিয়ে যাওয়া হ'ল, সঙ্গে একটু করে বিট-গাজরের আচার। এবার ওরা রুটি নিয়ে এল। রুটি কিন্তু থালায় দেবার নিয়ম নেই। হাত পাততে হবে, ওরা হাতে দিয়ে যাবে। একটা রুটি কেউ বলে না, এক লাখ রুটি, বা এক লাখ প্রসাদী বলতে হয়। এত কিছুর পরেও কিন্তু খাওয়া শুরু হল না। মাধবকে বললাম, দ্বিতীয়বার যদি এ অবস্থায় থাকতে হয়, তাহলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে। যাহোক, খুব তাড়াতাড়ি দু'টো রুটি শেষ করে ফেললাম। খিদে থাকলেও বৃষ্টিতে ভিজে, ডালরুটি খাবার ইচ্ছা আর রইলো না। তীরথ আমাদের একটু বসতে বললো। একসঙ্গে উঠতে হবে, এটাই প্রথা। কিন্তু এরপর যা শুনলাম, তাতে তো অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম। বাসন নিজেদের মেজে পরিস্কার করে দিতে হবে। ধনী, দরিদ্র, সবার এক নিয়ম। এখনও বুঝতে পারছি না শুধু নিজের থালা মাজতে হবে, না রান্নার সমস্ত বাসন নিজেদের মাজতে হবে। এবার দেখা গেল অনেকেই ছাই দিয়ে বাসন মাজতে শুরু করেছে। বড় বড় দুটো ড্রামে গরম ও ঠাণ্ডা জল রাখা আছে। আমরা কোনমতে জল দিয়ে থালা ধুয়ে একছুটে ঘরে ফিরে এলাম। নিজেদের শোবার জায়গায় ফিরে এসে দেখি, পাঞ্জাবিদের নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে খুব তর্ক বেধেছে। উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়ছে। শিখরা কোমরে ছোট তরবারি রাখে, যাকে কৃপাণ বলে জানতাম, কিন্তু এখানে দেখি তারা বেশ বড় বড় তরবারি কোমরে ঝুলিয়ে এসেছে। দেখি শিখরা কোমরে ঝোলা খাপ থেকে তরবারি বার করে, "মাঠমে আও দেখ লেঙ্গে" ইত্যাদি বলতে শুরু করেছে। হাতে খোলা তরবারি, মুন্ডু যাবে কিনা চিন্তায় আছি। শেষে এক সাধু পাঞ্জাবি ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে, আমাদের জানালেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই, এটা ওদের নিজেদের ব্যাপার। বুঝলাম ইনি এই গুরুদ্বোয়ারার প্রধান। ক্রমে রাত বাড়ছে। শুয়ে পড়লাম।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল তীরথের ডাকে। চটপট হোল্ড-অল বেঁধে নিলাম। সামান্য কয়েক চুমুক চা খেয়ে মালপত্র নিয়ে, বাসে চলে এলাম। মালপত্র রেখে, জলখাবার খেয়ে নিলাম। আজই আমরা গোবিন্দঘাট থেকে হেঁটে ঘাংঘারিয়া যাব। যোশীমঠ থেকে বাস রাস্তা খুব সরু। বদ্রীনারায়ণ থেকে সকালে যে সব বাস ছেড়েছে, সেগুলো একে একে যোশীমঠ এসে পৌঁছল। সবার শেষে যে গাড়িটা আসলো, তাতে একটা সবুজ পতাকা লাগানো আছে। এটাই এ পথের সিগনাল। সবুজ পতাকা মানে এরপর আর কোন গাড়ি ওদিক থেকে এদিকে আসবে না। এবার এদিক থেকে গাড়ি ছাড়তে পারে। এবার এদিক থেকে একে একে বাস ছাড়তে শুরু করলো। সব শেষের গাড়িতে সবুজ পতাকাটা লাগানো হবে। এখান থেকে গোবিন্দঘাট মাত্র আঠার কিলোমিটার পথ। সকাল সাড়ে দশটার সময় নামলাম গোবিন্দঘাটে। সামান্য দূরেই গুরুদ্বোয়ারা। তীরথ চটপট ওদের ও আমাদের মালপত্র এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে দিল। সিমেন্টের ছোট ছোট খোপে মাল রাখার সুন্দর ব্যবস্থা। মাল রাখার রসিদও পেলাম। একতলায় নেমে এসে চা খেলাম।

এবার হাঁটতে হবে। কাঁধের ঝোলাব্যাগে ওয়াটার প্রুফ ও টুকিটাকি জিনিস নিয়ে নিলাম। তিনজনের তিনটে ঝোলাব্যাগের একটার ভিতর একটা রামের বোতল। আমার অফিসের আর্মডগার্ড কল্যাণদা এনে দিয়েছিল। একটা ব্রীজ পার হয়ে অপর পারে এসে জায়গাটার একটা ছবি তুলে নিলাম। ইতিমধ্যে তীরথ, ওর বোন, মা ও ভগ্নীপতি এসে উপস্থিত হ'ল। তীরথের বোন আমাদের তিনজনকে অনেকটা মনাক্কা, কিশমিশ, পেস্তা, মিছরি আর ছোট এলাচ দিল। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। তের কিলোমিটার পথ হেঁটে, আজ যাব ঘাংঘারিয়ায়। এইরকম হাঁটা আমার এবারই প্রথম। ফলে মনে বেশ হিরো হিরো ভাব। হাঁটতেও বেশ ভাল লাগছে। অনেকটা পথ হেঁটে 'জঙ্গলচটি' তে পৌঁছে সামান্য পকোড়া আর চা খেয়ে নিলাম। তীরথ কিছুতেই দাম দিতে দিল না। ভগ্নীপতি তীরথের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে। ফলে ওদের হাঁটার গতি খুব কম। ওদের সাথে ওর বোনও হাঁটছে, মা যাচ্ছেন কাণ্ডিতে। এরপর 'পাল্লুগাঁও' বা 'পান্নাগাঁও' এসে আর এক দফা চা, বিস্কুট ইত্যাদি খেয়ে নিয়ে, তীরথদের চা বিস্কুটের

দাম অগ্রিম দিয়ে, ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে হাজির হ'ল। তীরথরা আসতেই দোকানদার ওদের চা, বিস্কুট দিল। আবার দু'হাত ভরে পেস্তা, মনাক্কা ইত্যাদি নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। এত পরিস্কার মিছরি, এত বড় বড় মনাক্কা ও কিশমিশ এর আগে খাওয়া তো দূরের কথা, চোখেও দেখি নি! 'ভিউডাঁর' নামে একটা ছোট্ট গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে তীরথ আমাদের আপেল, পালকপাতা নামে একপ্রকার পাতার বড়া আর চা খাওয়ালো। বড়াগুলো অনেকটা এখানকার বেগুনীর মতো। গরম গরম খেতেও বেশ ভালই লাগছিল। ক্রমে ক্রমে শুধু তীরথের দলটাই আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল। এবার আমরা অনেকটা এগিয়ে গেলাম। পথ যেন আর শেষই হয় না। বেশ কষ্টকরও বটে। তবে যতই খারাপ রাস্তা হোক, এই প্রথম হাঁটছি, তাই সেরকম কোন কষ্ট হচ্ছে না। সামনে বেশ খানিকটা জায়গা উপত্যকা মতো। সেটা পার হয়ে দাঁড়ালাম। যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি প্রসারিত করেও, কোন লোকজন চোখে পড়লো না। আরও কিছুটা পথ হেঁটে ঘাংঘারিয়া এসে পৌঁছলাম।

একটা দোকানে বসে চা খেলাম এবং ডিম পাওয়া যায় দেখে, আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে ডিম সিদ্ধ করতে বলে, তীরথদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাঞ্জাবিদের একটি দলের সঙ্গে গেলাম গুরুদ্বোয়ারায়। তীরথও তার সঙ্গীদের নিয়ে পৌঁছল। বাইরে নোটিশ বোর্ডে বড় বড় করে লেখা আছে যে, গুরুদ্বোয়ারায় মাদক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ধূমপান নিষিদ্ধ। খুব চিন্তা হচ্ছিল এই ভেবে যে, আমার কাপড়ের ঝোলা ব্যাগে রামের বোতল আছে, তামাক তো আছেই। ব্যাগে একটু হাত লাগলেই বোঝা যাবে, ভিতরে কী আছে! রামের বোতল যতই ওষুধ হিসাবে নিয়ে আসি বা ব্যবহার করি না কেন, মাদক দ্রব্য তো বটে।

যাই হোক গুরুদ্বোয়ারা কর্তৃপক্ষ আমাদের দশ নম্বর ঘর দিলেন। এই ঘরগুলো মূল হলঘরের মতো ভাল নয়। টিনের ঘর। ঘাংঘারিয়ার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। ঘর নিয়ে আমরা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। যা বুঝলাম, মূল হলঘরে শুধু পাঞ্জাবি শিখদেরই জায়গা দেওয়া হয়। তীরথ কর্তৃপক্ষকে জানালো যে আমরা তাদের পরিবারের সঙ্গে এসেছি। ফলে আমাদের, তীরথ ও আর সব পাঞ্জাবিদের সাথে, মূল হলঘরে স্থান দেওয়া হল। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গোটা বার-তের কম্বল পেলাম। মেঝেতে বেশ কয়েকটা পেতে, গায়ে দেওয়ারগুলো ভাঁজ করে সাজিয়ে রেখে, দু'টো কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ ও ওয়াটার বটলগুলো মাথার কাছে রেখে, যে ব্যাগটায় রামের বোতল আছে, সেটা নিয়ে বাইরে যাব বলে প্রস্তুত হলাম। তীরথের মা বললেন, বেটা সব সামান এখানে প্রেমসে রেখে যাও, কোন চিন্তা নেই। কী বলবো ভেবে না পেয়ে বললাম, ব্যাগে গরম জামা আছে। ঠাণ্ডা লাগলে পরে নেব। হলঘর থেকে বেড়িয়ে আবার সেই চায়ের দোকানে আসলাম। ডিম সিদ্ধগুলো এবার কাজে লাগানো গেল। সঙ্গে আর এক রাউন্ড গরম চা। লক্ষ্য করলাম দোকানটার পাশেই একটা ডাকবাংলো আছে। ঠিক করলাম আর এক মুহূর্তও ওই গুরুদ্বোয়ারায় থাকা নয়। কোনভাবে জানাজানি হয়ে গেলে আমাদেরও বিপদ, তীরথও খুব অপমানিত হবে। মাধব ও দিলীপ গেল ডাকবাংলোয় খোঁজ নিতে। কিন্তু ওখানে জায়গা পাওয়া গেল না। ওদের বললাম, গুরুদ্বোয়ারার পাশেই একটা ছোট্ট হোটেল মতো আছে, ওখানে একবার চেষ্টা করে দেখতে। ব্যবস্থা হলে তীরথকে একটু বুঝিয়ে বলতে যে, আমাদের গুরুদ্বোয়ারায় থাকতে অসুবিধা হচ্ছে। ভাবছিলাম তীরথ চাইছে কী করে আমাদের আরও বেশি আরামে, আরও ভালভাবে রাখা যায়, আর আমরা চাইছি কী করে ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মাধব ও দিলীপ চলে গেল। আমি সমস্ত বাধার একমাত্র কারণ, ছোট্ট একটা বোতল আগলে, দোকান থেকে একটু দূরে একটা পাথরের ওপর, ওদের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। হেমকুণ্ড সাহিব প্রায় পনের হাজার দুশ' ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ভেবেছিলাম এখানে থাকলে সুবিধা মতো ঘর না পেলে, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে সামান্য রামের প্রয়োজন হতে পারে। এখন দেখছি গোবিন্দঘাটে ওটাকে সুটকেসে রেখে এলেই ভাল করতাম। প্রায় মিনিট কুড়ি কেটে গেল, একা একা বসে আছি, কারো পাত্তা নেই। বাধ্য হয়ে আবার গুরুদ্বোয়ারার দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি মাধবরা তীরথের সাথে গল্প করছে। আমাকে দেখেই তীরথ বললো, 'রায় তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আছি। ঘরের মধ্যে খেও না। বাইরে যতবার ইচ্ছে খেয়ে আস, কেউ কিছু বলবে না'। বুঝতে পারছি না ওরা তীরথকে ঠিক কী বলেছে। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি, যে ওরা নিশ্চয় বলেছে যে আমার অসুবিধা হচ্ছে, তাই ওরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। আরও বুঝলাম যে সে চেষ্টা সফল হয় নি। ভাবছি ওদের হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাকে ওরা তীরথের কাছে মাতাল বানিয়ে ছাড়েনি তো? পরে সব জানলাম। ওরা বুদ্ধিটা ভালই বার করেছিল। ওরা তীরথকে বলেছিল, আমি প্রচণ্ড রকম ধূমপান করি। এখানে সেটা একবারে নিষিদ্ধ। তাই আমি চাই এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে। অবশ্য সারাদিন আমরা এক সঙ্গেই থাকবো, এক সঙ্গেই পথ হাঁটব।

পাশের একমাত্র হোটেলে জায়গাও ছিল। ভাড়া মাত্র পনের টাকা। মাঝ থেকে লাভ হল, পালানো তো গেলই না, অনবরত তীরথ মাধবকে বলছে, 'এই ব্যানার্জী, রায়কো সিগারেট দেও'। সে এক মহা অস্বস্তি। ক্রমে রাত নেমে এল। তীরথের সঙ্গে ভেতরে গেলাম। ভয় হচ্ছিল এখানেও খোলা জায়গায় বসে, রুটি হাতে 'শতনাম এ হ্যায় গুরু' গাইতে হবে কী না। পাশের চায়ের দোকানে গরম আলুর পরোটা পাওয়া যায় শুনে এসেছি। তবু গরম পরোটা ছেড়ে তীরথের সাথে ডাল, রুটি খেতে যেতে হল। এখানেও দেখছি সমস্ত মহিলারা রান্নার কাজে ব্যস্ত। তবে খাওয়ার জায়গাটা খোলা আকাশের নীচে নয়। এখানে ঠাণ্ডা অবশ্য অনেক বেশি। বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে হাত ধুয়ে, সবার সাথে লাইনে বসে পড়লাম। ডাল, তরকারি ও রুটি। দু'টো রুটি খেলাম। তীরথ ভাবলো আমরা লজ্জা পাচ্ছি। সে আমাদের আরও রুটি খাবার জন্য জোর করতে লাগলো। সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গেলাম বাসন মাজতে। তীরথের বোন কিন্তু এবার আমাদের কিছুতেই বাসন মাজতে দিল না। সে বললো, 'হাম তুমকো ভাইয়া বোলা', ইত্যাদি। যাক ভাগ্য ভাল, এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। তীরথ পাশের চায়ের দোকানে ছুটে গিয়ে আমাদের, বিশেষ করে আমাকে, সিগারেট দিতে বলে এল। এত লজ্জা করছিল কী বলবো! বৃষ্টি শুরু হল। ঘরে ফিরে এসে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আগষ্ট মাসের উনিশ তারিখ। ঘুম ভাঙ্গলো তীরথের 'এ রায় উঠো' ডাকে। উঠতেই কফির গ্লাস এগিয়ে দিল। ভাবলাম গুরুদ্বোয়ারা থেকেই কফি দেওয়া হয়েছে। পরে শুনলাম পাশের চায়ের দোকান থেকে তীরথ আমাদের তিনজন ও ওর পরিবারের সবার জন্য কফি কিনে এনেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। কিছু খাওয়া হল না। মনে মনে ঠিক করলাম রাস্তায় যাহোক খেয়ে নেব।

হেমকুণ্ড যাবার রাস্তা একটু ওপরে উঠে ইংরাজি "ওয়াই" (Y) অক্ষরের মতো দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকটা নন্দন কাননের পথ, ডানদিক গেছে হেমকুণ্ড সাহিব। এখানে এসে জানতে পারলাম, হেমকুণ্ডে বিশাল গুরুদ্বোয়ারা স্থাপিত হচ্ছে। গুরুদ্বোয়ারা তৈরি শেষ হতে ১৯৮২-৮৩ সাল। বর্তমানে ওখানে থাকবার ব্যবস্থা নেই। হেমকুণ্ডের উচ্চতা ১৫,২১০ ফুট। দূরত্ব ঘাংঘারিয়া থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার। তীরথ তার ভগ্নীপতিকে নিয়ে হাঁটা শুরু করার আগে, মুঠো মুঠো কিশমিশ, পেস্তা, মনাক্কা, ছোট এলাচ আমাদেরও দিল, নিজেরাও নিয়ে চিবোতে শুরু করলো।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। আশ্চর্য, এ পথে এত লোকের যাতায়াত, কিন্তু কোন দোকান নেই। চারদিকে নানারকম ফুলের সমারোহ। বেশিরভাগ ফুলের রঙ বেগুনী। এমন কী প্রজাপতিগুলো পর্যন্ত বেগুনী রঙের। এতটা রাস্তায় ব্রহ্মকমল কোথাও দেখলাম না। তীরথরা পিছিয়ে পড়েছে, তাই মাঝেমাঝেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা হলে আবার এগিয়ে যাচ্ছি। এতক্ষণে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। চা খেয়ে নিলাম। তীরথের মা ও বোন, দু'জনেই দেখলাম এবার কাণ্ডি নিয়েছেন। আমরা বেশিরভাগ পাকদণ্ডি ব্যবহার করায়, অনেক এগিয়ে গেলাম। এবার রাস্তার পাশে গ্লেসিয়ার নেমে এসেছে দেখে খুব ভাল লাগলো। সাদা বরফের টুকরো হাতে নিয়ে অনেকটা পথ গেলাম। এখানে দেখি চারপাশে হলুদ রঙের একরকম থোকা থোকা ফুল ও হালকা নীল রঙের একরকম চার পাপড়ির ফুল। আমার মনে হল এই নীল রঙের ফুলটাই, এ রাজ্যের সবথেকে সুন্দর ফুল। নন্দন কানন, যাকে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স বলে, সেখানেও এত সুন্দর ফুল আছে কীনা কে জানে। সর্বাঙ্গে কাঁটা, আর কী যে অদ্ভুত একটা নীল রঙ কী বলবো। আর কিছুটা পথ এগিয়েই দূরে, বহু ওপরে, ফিকে সবুজ রঙের ফুলের সাম্রাজ্য চোখে পড়লো। একজন যাত্রীর কাছে শুনলাম, ওগুলোই ব্রহ্মকমল। এই ফুলেই কেদারনাথের পূজা হয়। ১৪,০০০ থেকে ১৬,০০০ ফুট উচ্চতায়, পাথুরে জমিতে এরা জন্মায়। হাঁটার গতি যেন বেড়ে গেল। রাস্তায় দু'একটা ব্রহ্মকমল পরে থাকতে দেখলাম, বোধহয় কোন যাত্রী তুলে আবার ফেলে রেখে গেছে। আমরা কুড়িয়ে নিলাম। এত উগ্র গন্ধ বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হল, আমাদের এখানকার শিয়ালকাঁটা ফুলের গন্ধের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। তবে গন্ধের তীব্রতা বেশ কয়েকগুণ বেশি। ফুলের ভিতরে চার-পাঁচটা ফুলের মতো রেণুর আধার। খুব হাল্কা সবুজ রঙ। ভুট্টার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে, শেষের দিকে যেমন সাদাও নয়, সবুজও নয় গোছের রঙ দেখা যায়, অনেকটা সেরকম। পাপড়িগুলো এত পাতলা, যে মনে হয় এদিক থেকে ওদিক দেখা যাবে। তীরথ এসে হাজির হল। ও বললো পরে অনেক পাবে, এগিয়ে চল। ওর হেমকুণ্ড এই দ্বিতীয়বার। হেমকুণ্ড সাহিব ওদের ধর্মের একটা অতি পবিত্র জায়গা।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা সত্যিই ব্রহ্মকমলের রাজত্বে এসে পৌঁছলাম। গাছগুলো অনেকটা মূলো গাছের মতো, গোটা গাছটায় ওই ফুলের গন্ধ। গাছে হাত দিতে আমাদের হাতে, জামাকাপড়ে তীব্র ফুলের গন্ধে ম'ম করতে লাগলো। গাছের পাতার মধ্যে যে শিরাগুলো দেখা যায়, সেগুলো বেশ উঁচু ও স্পষ্ট, অনেকটা খরগোশের কানের মতো। হেমকুণ্ড প্রায় পৌঁছে গেছি। মেঘ করে আসছে ছবি তুলতে হবে, তাই ফুল না তুলে হাঁটার গতি বৃদ্ধি করলাম। রাস্তা এবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়। অনেকগুলো সিঁড়ি, তাই সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্টও প্রচুর। তবে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। অপর পথটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। কষ্ট লাঘব করতে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপভোগ করতে, আমরা রাস্তা দিয়েই এগোলাম। দূরে একটা নীল ও হলুদ রঙের পতাকা উড়তে দেখা গেল। সমস্ত গুরুদ্বোয়ারায় এই দুই রঙের পতাকা উড়তে দেখেছি। পতাকা লক্ষ্য করে আমরা গুরুদ্বোয়ারাতে এসে হাজির হলাম। কাজ শেষ হতে এখনও অনেকদিন লাগবে। এতবড় এলাকা নিয়ে, এত বিশাল গুরুদ্বোয়ারা এখানে তৈরি হচ্ছে, ভাবতেও পারি নি! বড় বড় লোহার স্ট্রাকচার, টিনের ছাদ, মাঝখানে একপাশে মন্দিরের মতো। ওখানে ওদের ধর্মগুরুর ছবি। ছবিতে প্রচুর ব্রহ্মকমল ফুল দেওয়া আছে। ব্রহ্মকমলের মালা দিয়ে সাজানো। গুরুদ্বোয়ারার পিছনেই কুণ্ড। ওপরের পাহাড় থেকে এই বিশাল বড় লেক বা কুণ্ডের জলে গ্লেসিয়ার নেমে এসেছে। কুণ্ডের পারে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, জলের গভীরতা খুব বেশি নয়। এই এলাকাটা সাতটা পাহাড়ের চূড়া দিয়ে ঘেরা। আগে এ জায়গাটা লোকপাল নামে পরিচিত ছিল। দশরথ পুত্র লক্ষণ এই এলাকার আরাধ্য দেবতা ছিলেন। যাহোক, কুণ্ডের একপাশে অনেক পাঞ্জাবির ভিড়, সবাই কুণ্ডে স্নান করতে ব্যস্ত। সকলে আমাদের এই কুণ্ডে স্নান করার জন্য অনুরোধ করলেন। অনেকে আবার বললেন, যে কুণ্ডের জল গরম এবং এই কুণ্ডে স্নান করলে, সব রকম রোগমুক্তি হয়, শরীর ভাল হয়, পুণ্য অর্জন তো আছেই। রোগমুক্তি হয় কীনা জানিনা, তবে কুণ্ডের জল যে কীরকম গরম, সে তো গ্লেসিয়ার দেখেই বুঝতে পারছি। একে মেঘ করে আছে ও বেশ ঠাণ্ডা, তার ওপর ওই বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে আমরা রাজি হলাম না। ওরাও ছাড়বার পাত্র নয়। সবাই একসঙ্গে সাহস ও উৎসাহ দিতে লাগল, দেখে মনে হয় নিজেরা স্নান করে রোগমুক্তি ও পুণ্যলাভের থেকে, আমাদের স্নান করিয়ে রোগমুক্ত ও পুণ্যলাভ করানোয়, তাদের আগ্রহ অনেক বেশি। একটা জাপানি ছেলেকে দেখলাম, ওই ঠাণ্ডা জলে মনের সুখে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। ওর ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। আমাদের সাথে কোন দ্বিতীয় বস্ত্র, এমন কী গামছা পর্যন্ত নেই। কুণ্ডের ধারে ধারে জলের মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে আছে। আমরা একটা পাথরের ওপর কিছুক্ষণ বসে চলে আসবো ঠিক করলাম।

এবারে গুরুদ্বোয়ারার সাধুবাবা এগিয়ে এসে প্রায় হাত জোড় করে আমাদের স্নান করতে অনুরোধ করলেন। তিনিও বললেন এই জলে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়, অনেক সুস্থ বোধ হয়। তাঁর বয়স, সৌম্য চেহারা, ধবধবে সাদা দাড়িগোঁফ, এবং সমস্ত পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর সম্মান দেখে, তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আগে জানতাম না তাই সঙ্গে স্নান করার কোন কাপড় নিয়ে না আসায়, স্নান করায় অসুবিধা আছে। ভাবলাম সবজান্তা বাঙালি বুদ্ধিতে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। ও বাবা, আমাদের বাসের পরিচিত পাঞ্জাবিরা আমাদের শুকনো ভাঁজ করা ধুতি দিয়ে, স্নান করতে বললো। বাধ্য হয়ে প্রথমে আমি প্যান্ট জামা ছেড়ে, ধুতি পরে হাঁটু জলে নামলাম। মনে হ'ল এক হাঁটু বরফে পা দু'টো ঢুকে গেল। ডুব না দিয়ে পারে উঠে এলাম। পাঞ্জাবিরা পারে দাঁড়িয়ে, একসঙ্গে হাত নেড়ে উৎসাহ দিয়ে আমাকে ডুব দিতে বললো।

আবার নামলাম, আবার উঠে এলাম। ডুব দেওয়া ঠিক হবে কীনা বুঝে উঠতে পারছি না। এবার আবার সেই বৃদ্ধ সাধুবাবার অনুরোধ। যা আছে কপালে ভেবে ডুব দিয়ে দিলাম। এক ডুবেই কাত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বন্ধ হবার জোগাড়। চোখে যেন ঝাপসা দেখছি, কানের ভিতর লক্ষ ঝিঁঝিঁ পোকা একসাথে গলা সাধতে শুরু করে দিল। ঢোক গিললে গলা সাধা সাময়িক বন্ধ করেই, আবার শুরু হয়। পাথর ধরে মিনিট খানেক দাঁড়াতে, একটু সুস্থ বোধ করলাম। উঠে এসে গা মুছে প্যান্ট জামা পরে নিলাম। বাকীরাও একইভাবে স্নান সারল। সবার পোষাক বদল হলে, গুরুদ্বোয়ারার ভিতর গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গ্লাসে গরম চা দিয়ে গেল। এবার বুঝছি স্নান না করলে কী ভুল করতাম। মনেই হচ্ছেনা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পথ হেঁটে, পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা পেরিয়ে এসে, আমরা এখন ১৫,২০০ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি। একবারে নতুন উৎসাহ ফিরে পেলাম। শরীর খুব সুস্থ বোধ হচ্ছে। ওঁরা বললেন গুরু গোবিন্দ সিং-এর আশীর্বাদ।
আকাশে বেশ মেঘ করে আছে। তীরথ বললো এবার ফেরা প্রয়োজন, বৃষ্টি এলে রাস্তায় কষ্ট হবে। আরও কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে, বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে, আমরা ফেরার পথ ধরলাম। শরীরে-মনে যেন অনেকটা জোর বেড়ে গেছে। মনে হল আজই একবার নন্দন কানন ঘুরে এলে বেশ হত। পথে আসতে আসতে দু'হাত ভরে যত পারি ব্রহ্মকমল তুলে, পলিথিন ব্যাগে ভরে নিলাম। নানা রকম ফুলও দু'চারটে করে তুলে নিলাম। এ যেন দীঘার সমুদ্রপারে ঝিনুক কুড়োনো। এগুলো নিয়ে কী হবে জানিনা, জানিনা ব্রহ্মকমলগুলো এত সব জায়গা ঘুরে বাড়ি নিয়ে আসতেও পারবো কীনা, তাও মনের আনন্দে তুলছি। ধীরে ধীরে আগেকার পথ ধরে নামতে লাগলাম। এখন সব চেনা চেনা দৃশ্য। আকাশ কিছুটা পরিস্কার হয়ে আসছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোন পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

অরণ্যের রূপকথারা

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

~ ডুয়ার্সের তথ্য~ ডুয়ার্সের আরো ছবি ~

ডেস্টিনেশন ডুয়ার্স! মন আনচান করা মনসুনেই আমরা রওনা হলাম জঙ্গলের টানে। আমরা - আমি নোয়েল, আমার সঙ্গিনী ব্রুনি, ব্রুনির বান্ধবী র‍্যাচেল আর তার বয়ফ্রেন্ড স্যাম এবং আরেক বন্ধু পল। চোদ্দই অগাষ্ট, ২০১৩, রাতের শিয়ালদা ষ্টেশন ছেড়ে রেলগাড়ি ঝমাঝম। সবাই বাড়ি থেকেই পেটপুরে লুচি-আলুরদম। আলগোছে কিছু কথা। তারপর যে যার বার্থে ঘুমঘুম . . .। ঠিক তখনই বৃষ্টি শুরু - ঝুমঝুম-ঝিমঝিম। খোলা জানলা গ'লে ঘুমের ভেতরেও খানিক টুপটাপ টপটপ. . .। রিনরিনে মিহি ঠাণ্ডা হাওয়ার মায়াতে মাথা না পেতে, রেলকোম্পানির ঝাঁঝরিকাটা লোহাসিরিয়াস জানলা ধরে টান - ধুপধাপ ধুপধাপ। বাইরে তখনও ঝুমঝুম-সন্‌সন্‌ . . . লেটগাড়ি ঝমাঝম . . . সারারাত ঘুমঘুম . . . . . ।

নতুন সকালে যখন নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে ঝোলা নিয়ে নামলাম তখন ভারতীয় সময় মাফিক সাড়ে ন'টা। পরের চারটে দিন যেন বয়ে গেল আমাদের ডুবিয়ে ভাসিয়ে হাসিয়ে . . . একেবারে-এ-এ-এ তলিয়ে গিয়ে স্বপ্ন-স্বপ্ন ঘোরের গভীর থেকে পাড়ে জেগে উঠে দেখি; ঠিক পেয়ে গেছি সেই আশ্চর্য ঝিনুক, যার ভেতরে জমা আছে সেই দুর্লভ - মেমোরিzzzz।

এবারের ট্যুরের সবটা ব্যাখ্যা করতে পারব বলে মনে হয় না। কোথাও বাস্তবের চৌহদ্দিতে হঠাৎ স্বপ্নের বেপরোয়া হানাদারি, আবার অতর্কিতে আলো-আধাঁরি স্বপ্নের পাতলা আস্তরণ ফুঁড়ে রিয়েলিটির চরম টর্চলাইট। এ কি পরাবাস্তব না মারিজুয়ানা! এ কী কাণ্ড বলো দেখি! NJP-তে নামতেই দেখি মিষ্টি মেয়ে ডেইজি দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষায় আমাদের। দেখে ভালো লাগল, ঠিক আগের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণোচ্ছল আছে ও! বছরের এই সময়টা এখনও কোনো না কোনো জঙ্গল-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়! সে কাহিনির বিস্তারে যাব না। প্রজাপতি, পোকা-মাকড় ও ক্ষ্যাপা-বাইসনের মতো পাহাড়ি ঝোরার আসক্তি ডেইজিকে ক্রমশঃ আরো ধাঁধালো করে তুলছে আমাদের কাছে। আপাতত এখান থেকে ডেইজি আমাদের সঙ্গে। গন্তব্যের গাড়ি অপেক্ষায়, মাল তোলা চলছে। এসবই প্রত্যাশিত। এই ট্যুরে আমাদের স্থান, যান, অভিযান, খানা-পিনা এসব যিনি অলক্ষ্যে থেকে পরিচালনা করে চলেছেন, পল বলে দিয়েছিল তাকে যেন আমরা ব্রো নামে ডাকি। ডুয়ার্সের এ-তল্লাটের গাছেরা হাওয়ায় মাথা দোলালে ধ্বনিত হয় চলমান অশরীরির নাম ---- ব্রো ... ব্রো ... ব্রো (অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ)। ষ্টেশনেও দেখা মিলল না ব্রো-এর। পাঠিয়ে দিয়েছে স্থানীয় একজনকে আন্তরিক আতিথেয়তার সৌজন্যে। প্রথম যখন পরিচয় হল শ্রীযুক্তকলপল্লবিতবিহঙ্গসুখ মহাশয়ের সঙ্গে, আমরা নিঃসংশয় হলাম, এ ট্যুর হতে চলেছে চমকের 'চাঁদের পাহাড়'। আমরা ঠিক করে নিলাম ওনাকে আমরা সুখ নামে ডাকব। গাড়ি চালু হোতেই সুখ হাতে হাতে বিলি করে দিল সকালের নাস্তা। অভাবনীয়! জলপাইগুড়ির মসৃণ-বন্ধুর রাস্তা ধরে গাড়ি চলল আমবাড়ি - গজলডোবা - ক্রান্তি হয়ে মুর্তির পথে। ডেইজি বলল, বাইপাস ধরেছি। স্টিয়ারিং-এ চালক পাহাড়ি। শুকনো রুটিন থেকে নিঃসারে চারপাশ নরম হতে না হতেই শহুরে চিনা-মাটির ছাঁচগুলো ভেঙ্গে-খসে পড়তে লাগলো গা থেকে। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল টাটকা আদিম 'আমি'গুলো। হাসি-ঠাট্টা-খুনসুটিতে হোটেলে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারোটা। রিসর্ট মূর্তি রেসিডেন্সি।

মনোমোহিনী মূর্তি নদীকে ডানহাতে রেখে বাঁ-দিকে ছোট্ট বাঁক নিতেই সামনে আদিগন্ত সবুজ গালিচার মাঝে হলুদ ড্যাফোডিলের মতো ফুটে আছে একচালা-দোচালার সুখনিবাসগুলি - আগামী দুদিনের জন্য আমাদের খাসতালুক। এখানেই প্রথম দেখা পেলাম চলমান অশরীরির। নাম-পরিচয় নয়, প্রথমেই জানতে চাইলেন, 'রাস্তায় হাতি পেলেন?' একঝলক হতাশ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'আছেন তো আমার সঙ্গে, পেয়ে যাবেন'। হোটেল-রুম, ডাইনিং, ম্যানেজারবাবু, আর কলিন, কোয়াককে (ওরা কিন্তু রাজহাঁস) পেয়ে অলরেডি আমরা আটখানা! ঠিক তখনই ডেইজি পেশ করল আরেক চমক, পাহাড়ি স্কোয়াশ, বাতাবি লেবুর খোসা-কুচি, শুকনো গাঁজা পাতা, আর অজানা আরো কী -একটা দিয়ে বানানো ওর নিজস্ব রেসিপি। তার যে কি সোয়াদ সে যে-না খেয়েছে তাকে বোঝানো আমার কম্মো নয়। বলল, লাদাখ গিয়ে এইরকম কিছু চেখে দেখেছিল। ওখানকার লোকেরা অবশ্য ইয়াকের দুধ দেয় সামান্য। তাতে অল্প কষাটে গন্ধ হয়। ফিরে এসে ও নিজের মতো কিছু অদল-বদল করেছে এতে। নিমেষের মধ্যে চেটে-পুটে সাফ এক পেল্লায় টিফিন বক্স। স্ট্রিক্ট ডায়েটে থাকা র‍্যাচেলও আমাদের টিটকিরি গায়ে-না-মেখে তার বাহারি নেল-পালিশ শোভিত অতি যত্ন-লাঞ্ছিত সূঁচালো নখর-সম্বলিত সুললিত তর্জনীটি চাটিয়া চাটিয়া এমত অবস্থার অবতারনা করিয়াছিল, যে স্যাম আমায় জনান্তিকে ডাকিয়া অতি সন্তর্পণে কানে কানে বলিয়া ফেলিল, 'এনগেজমেন্ট রিংটা ভাগ্যিস ঐ আঙ্গুলে পড়ায় না, তা না হোলে অ্যাতোক্ষণে পেটে . . .'। কোনোমতে হাসি চেপে আমি কথা ঘোরালাম। ডেইজির কাছে জানতে চাইলাম এই উপাদেয় মলম মলম খাদ্যটিকে কি-নামে ডাকব! ডেইজি স্বভাবগত তৎপরতায় জবাব দিল, 'স্থানীয় নাম জানি না, তবে লাদাখ থেকে শিখে এসেছি যখন, একে লে-হালুয়া বলতে পারো'। হাল্কা হাসির খোলামকুচি ছড়াতে ছড়াতে পুরো দলটা গেলাম লাঞ্চ সারতে। সাদা-মাঠা ডাল-ভাত-ভাজা আর মাছের ঝোল, তাই যেন অমৃত। খাওয়া শেষ হতে না-হতেই দেখি গাড়ি রেডি। বুনো মোষের মতো গর্‌গর্‌ করতে থাকা জিপটি গর্জন করে রিসর্টের গেট পেরোনোর পর পিছনের দরজাটা টেনে দিলাম। আমরা চলেছি সামসিং হয়ে সান্তালেখোলা।

স্থানীয় ভাষায় 'খোলা' শব্দের অর্থ 'ঝোরা' - সৌজন্যে সেই ডেইজি। আর সান্তারা থেকে অপভ্রংশ সান্তালে বা সুনতালে। কমলালেবুর বাগান রয়েছে। তবে বর্ষায় কমলালেবুর এক টুকরো খোসাও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। খোসা না হোক আমরা দেখলাম 'খোলা' - বর্ষায় সেই ঝোরা তখন মত্ত হস্তিনী ; পাথরে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে তার মত্ততা যেন বলগা ছাড়া। ঝোরার ওপর যেইখানটায় কাঠ আর লোহার তার দিয়ে ঝুলন্ত পুল টানা আছে, ঠিক তার ওপারটায় পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে এক পেল্লায় পাহাড়। ওপারে যেন আর যাওয়ার উপায় নেই, অথচ পুলটা যেন সমানে হাতছানি দিয়ে ওপারে ফুসলাচ্ছে। হাতে রইল পুল আর আমরা সড়াৎ নেমে গিয়ে ঝোরার গা-ঘেষে দাঁড়ালাম। পাথরে পাথরে পা রেখে এই প্রবল পাগলামির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাধ। ঠিক এইসময় হাওয়া বেজে উঠল দামামার তালে (অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ)। মাথা তুলে দেখি পুল পেরিয়ে ওই পাহাড়ের দিক থেকে লোকালয়ের দিকে চলেছে গুরান, সঙ্গে গোটাচারেক জঙ্গলা মানব-শিশু ও একটা গাধা প্রজাতির জন্তু। যেতে যেতে বলে গেল, 'ওহে বুটিক-স্যাভি সিটিজেন, অতো কায়দা ভালো নয় এখানে, ঘোলা জলে ভেসে চলে আসছে গভীর অরণ্যের বুভুক্ষু জোঁকের দল।' পরিষ্কার বাংলায় বলল, সত্যি! বলতে বলতে মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে। আমরা তড়িঘড়ি ব্রিজের ওপর, কিন্তু পল-কে আটকানো গেল না। নাচতে নাচতে নেমে গেল শ্যাওলা ধরা পাথরে। পেছন পেছন গেল ডেইজি ছবি তুলবে বলে।

আমরা গুটি গুটি পুল পেরিয়ে এগোতে লাগলাম অজানাপুরীর দিকে। হাতে নামমাত্র ভাঙা ছাতা। রাস্তা শেষ হোলো যেখানে, দু'মানুষ সমান এক লোহার দরজা। আমরা খুব অবাক হোলাম দেখে, সেই দরজার ওপর ভাঙ্গা-চোরা-চল্টা ওঠা ইংরাজি হরফে লেখা আছে, 'হার্বাল ম্যাসাজ অ্যাভেলেবেল'। এ-ওর দিকে তাকালাম আমি আর স্যাম। স্যামের চোখ জোড়া চকচক করতে দেখলাম। পিছন থেকে পলের গলা শোনা গেল, 'ইংরেজদের সাথে সাথে ওসব বিলিতি কেতাও বিলেত গেছে। ব্রিটিশরা লন্ডন গেল এসব অ্যাবান্ডন করে দিয়ে। চলো দেখি হার্বাল-টি পাওয়া যায় কীনা ভেতরে গিয়ে দেখা যাক।' বৃষ্টি তখনও পড়ছে। আমরা সবাই কমবেশি ভিজেছি। দ্রুত সন্ধে নেমে আসছে পাহাড়ে। প্রস্তাব মন্দ নয়, তবে এই নিশ্চিহ্নপুরে কে আমাদের জন্য চায়ের পেয়ালা হাতে অপেক্ষায় থাকবে! নজরে এলো মায়াবী আমন্ত্রণের মতো গেটটা অল্প ফাঁক। ঠেলে ভেতরে ঢুকে প্রথমেই মনে হোলো চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা কোনো শয়তান ডাইনির আস্তানায় এসে পড়েছি। উঁচু ইমারত, কারুকাজ করা জানলা-দরজা, কেয়ারি করা বাগান, মাঝখান দিয়ে আলতো পায়ে চলা পথ এমন শুয়ে আছে যে তুমি না-হেঁটে পারবে না। আর ঠিক তখনই দেখলাম বাঁ-পায়ের গুলিতে ধরেছে জোঁক। বলতেই অভ্যস্ত হাতে সটান ছাড়িয়ে নিল ডেইজি। চুঁইয়ে সামান্য লাল দাগ। পল তৎক্ষনাত কাগজের টুকরো দিয়ে আটকে দিল ক্ষতের মুখ। একবার মনে হল ফিরে যাওয়া যাক। অথচ ভাবতে ভাবতেই মোহাবিষ্টের মতো এগিয়ে গেলাম বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটার দিকে। ঘরটার শার্সি গ'লে আলোর আভা ঠিকরে পড়ছিল ভেজা সরু পথটার ওপর। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম এক প্রস্থ ডাইনিং হল, যার লাগোয়া আরেকটি ঘর আছে, সম্ভবত কিচেন। ভেতর থেকে হাল্কা আওয়াজ ভেসে আসছে - কথা বলার শব্দ। ইতস্ততঃ করতে করতে ঢুকলাম, উঁকি মেরে দেখি চারজন বামন বেশ উঁচু গোল গোল গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো টুলে বসে গল্প করছে। আমাকে এক ঝলক দেখে চোখের নিমেষে গাছের গুঁড়ির টুল থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওরা রান্নাঘরে ছড়ানো কিছু আসবাবের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। একজন পালিয়ে গেল রান্নাঘরের অন্য একটা দরজা দিয়ে। আমাদের বাকীরা সবে ছাতা ঝেড়ে বসেছে ডাইনিং রুমের এক কোণে রাখা একটা বেশ বড় ডাইনিং টেবিলকে ঘিরে। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি রান্নাঘরের দরজায়। আশা করছি ভয় কাটিয়ে ওরা বেরিয়ে আসবে। এলো, তবে সেই লোকটি, যে পালিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়ে এলো তার থেকে সাইজে বড় একটা বল্লম। সোজা ধরল আমার কণ্ঠনালী বরাবর। আমি একমুহূর্ত চিন্তা করলাম তারপর গা থেকে ভেজা গেঞ্জিটা খুলে ফেললাম তুরন্ত। এতে কাজ হোলো। ওরা জানে শহরের মানুষ কোমরে গুঁজে রাখে অস্ত্র যা দিয়ে আগুন বেরোয়। আমায় ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝল আমি কারোর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আসি নি। বল্লম নামিয়ে নিল। ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্যাম। ভেজা গেঞ্জি নিংড়ানোর জন্য ও একটু আগেই খুলেছে গা থেকে। সুতরাং কোনো বিপদ ঘটল না। এতক্ষণে গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বললাম, 'চা পাওয়া যাবে?' সবাই চুপ। বুঝলাম গুরান ছাড়া এরা কেউ বাংলা জানে না। হাতের ইশারায় বোঝাতে হোলো। স্যাম সাইন ল্যাংগোয়েজ জানে। অনেক চেষ্টায় সফল হয়েছে বলে যখন মনে হচ্ছে তখন একজন হঠাৎ এক খাবলা নুন এনে স্যামের দিকে ছুঁড়ে মারল। রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমরা। পলরা ছুটে এলো। তারপর দেখা গেল স্যামের পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমরা কেউ খেয়াল করিনি কখন জোঁক ধরেছিল! অবস্থা স্বাভাবিক দেখে আমরা টেবিলে গিয়ে বসলাম। একটু পরে বাঁশের গুড়ির খোদল কাটা পেয়ালায় এলো গরম চা, সঙ্গে পেঁয়াজির মতো কী একটা। খেতে বেশ ভালো। ওরা যে এমন ভাজতে জানে এটা ধারনায় ছিল না। অবাকই হলাম। ডেইজি বলল, 'গুরান শিখিয়েছে নিশ্চয়ই'। বাইরে প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। এই পরিবেশ দারুণ লাগছিল তবু অন্ধকার ও জোঁকের ভয়ে তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়লাম। বেরোবার আগে স্যাম একজনের হাতে একটা একশ টাকার নোট ধরালো। সে নোট টাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। র‍্যাচেল বলল, 'পড়তে জানে?' ব্রুনি ফোড়ন কাটল, 'আসল কিনা দেখে নিল'। পুল পেরোনোর সময় আবার গুরানের সাথে দেখা। বাচ্চাদের নিয়ে ও ফিরছে। পল বলে উঠল, 'বিদায় বন্ধু'। গুরান আলতো হেসে জানতে চাইল, 'পেঁয়াজি খাও নি তো'! সকলে একসঙ্গে 'কেন' বলে উঠলাম। মিচকি হেসে গুরান বলতে বলতে হাঁটা লাগালো, 'ওটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের ডিম ভাজা'। স্যাম চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা যে একশো টাকা দিয়ে এলাম'। গুরান দূর থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'তাহলে এতক্ষণে ওরা তামাক পুরে বিড়ি বানিয়ে ফুঁকে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি গেলে আমি কাউন্টার পেতে পারি'। আলো তখন ভালোমতো মুখ লুকিয়েছে দানব-পাহাড়ের আড়ালে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গাড়ি পর্যন্ত এলাম। চালক পাহাড়ি জানতে চাইল, ঝোরার ওপারে যে সরকারি গেস্ট-হাউস আছে পাহাড়ের কোলে দারুণ সুন্দর, অতদূর আমরা গেছি কিনা! বর্ষা বলে বন্ধ। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নাকি ভিড় বাড়তে থাকে। আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করলাম। পল তাড়া দিল, 'গাড়ি ঘুমাও'! চালক পাহাড়ি সাঁ-সাঁ গাড়ি ছোটালো। রিসর্টে পৌঁছে আরেক কাপ করে কফি আর খাঁটি পেঁয়াজের পেঁয়াজি সহযোগে সান্ধ্য চা চলছে যখন, গুরানের শেষ রসিকতার রেশ তখনো রয়ে গেছে আমাদের হাসিতে।

পাহাড়, বৃষ্টি, হাতি এসব নিয়ে আড্ডা গড়ালো রাতের খাওয়ায়। বাইরে তখন বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। সারা আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার। গল্পের সাথে মেখে নিয়েছি রূপকথার মতো গরম গরম হাত-রুটি আর দেশি মুরগির মাংস। সেই রাতেই ঠিক করা গেল পরের দিন সকালের নাস্তা সেরেই মূর্তি নদীতে স্নান আর লাঞ্চের পর ধাওয়া করব বন্য জীবন গরুমারা পর্যন্ত। গণ্ডা চারেক রুটি আর কেজি খানেক মাংস সাঁটিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে যখন বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে আচারের শেষটুকু চেটে নিচ্ছি, ম্যনেজার বাবু অস্ফুটে বলে গেলেন, 'কপাল ভালো থাকলে হোটেলের হাতায় হাতি এসে দেখা দিয়ে যাবে আপনাদের। রাতে সজাগ থাকবেন'। উৎফুল্ল হব না ভয় পাব এই দোটানায় হাত চাটতে চাটতে শুতে গেলাম। ব্রুনির গলায় স্পষ্ট ভয়, 'উঠোনে হাতি আসে তো জানলাগুলো কাঁচের বানিয়েছে কেন! তার ওপর একটাও লোহার শিক দেয় নি! কী হোটেল রে বাবা! 'আমি যোগ করলাম, আমাদের আবার একেবারে ধারের কটেজ!' ব্রুনি ঘটাং করে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্রমাগত বৃষ্টিতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল তাই আলগোছে কম্বলটা গায় টেনে নিতে আমারও চোখে ঘুম নেমে এলো।

হাতি তো হাতি, দূর দূর তক্ হাতির নাদেরও কোনো চিহ্ন পায় নি ডেইজি ও পল। ওরা সাত-সকালেই নদীর ধারে হাঁটতে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম স্যাম ও র‍্যাচেলও এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। কলিন আর কোয়াককে বাগানময় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে পল। আর ডেইজি তার ফটো তুলে চলেছে। সারারাত বৃষ্টির পর দারুণ ঝকঝকে একটা সকাল হয়েছে। হাল্কা সাদা তুলোর মেঘের বুটিদার ঘন নীল জমিনের কাপড় পড়েছে আকাশটা। ঝলমলে রোদ্দুর কলিনের সাদা ডানায় এমন চমকাচ্ছে যে বারবার ডেইজিকে এক্সপোজার অ্যাডজাস্ট করতে হোচ্ছে। এরই মধ্যে চা এসে গেল সঙ্গে নানান রকম বিস্কুট ও ভুজিয়া। এমন সুন্দর সকালে, যতদূর চোখ যায় হাল্কা-ঘন সবুজের ঘেরাটোপে, কটেজের হাতায় বন্ধুদের সান্নিধ্যে বসে চায়ের আমেজ নিচ্ছি, অলস সময় বয়ে যাচ্ছে আলতো বিলি কেটে। স্বর্গচ্যুত শাপভ্রষ্ট দুই দেবকন্যা দুটি অপাপবিদ্ধ রাজহাঁস হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে পায়ের কাছে। একে বাস্তব বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। অ্যাতো ছিল সৌভাগ্যে! ঘোর ঘোর মেজাজে কাঁধে গামছা ফেলে চললাম নদীর দিকে। নদীর পার ধরে দূরের পাহাড়ি গ্রামে চলে যাওয়া রাস্তায় উঠে এলাম দু'মিনিটেই। রাস্তাটা সোজা দিগন্তের কাছে গিয়ে আবছা পাহাড়ের কোলে মিলিয়ে গেছে। আমি আর পল ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লাম। আমাদের আগে ডেইজি ফিনিশিং লাইনে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ালো। দৌড় শুরু হলো - ফটো তোলা হলো - দৌড় শেষ হলো - ১০০ মিটার হলো কীনা কেউ মেপে দেখে নি। এরপরই আমরা একে একে হাত ধরাধরি করে নেমে গেলাম মূর্তির জলে। পাড়ের দিকে তুলনামূলক বড় পাথরে পায়ে লাগছিল। নদীর মাঝ বরাবর যেতেই পাথর প্রায় নুড়ির সাইজের হয়ে গেল। বর্ষার নদীতে খুব স্রোত। অথচ কোথাও গোড়ালি কোথাও হাঁটু কোথাও কোমর তো কোথাও ডুব জল। স্যাম আর ডেইজি আমাদের মধ্যে সাঁতার এক্সপার্ট। পলও ভালোই জানে। ওরা বহতা জলে গা ভাসিয়ে ফূর্তি করতে লাগল, আর আমি, ব্রুনি ও র‍্যাচেল এক জায়গায় কোমর জলে গা ডুবিয়েই খুব মজা পাচ্ছি ভাব দেখালাম। স্যাম আলাদা ভাবে আমাকে, ব্রুনিকে ও র‍্যাচেলকে সাঁতার শেখাবার চেষ্টা করল, তবে সেটুকু শেখার মতো আয়াস বা আগ্রহ কারোর মধ্যেই দেখা গেল না। ঘন্টাখানেক যে-যার মনের খুশিতে গা-ভাসিয়ে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঠিক মাঝনদীতে কোমর ডুবিয়ে গোল হয়ে বসলাম এক অভিনব আড্ডায়। আমি আর স্যাম বসেছি উজানের দিকে মুখ করে। বসেছি বলা ভুল, স্যাম বুদ্ধি দিল - কোলের কাছের কোনো পাথর যেটা জমাট করে পোঁতা আছে, সেটা দু'হাতে ধরে বাকি শরীর স্রোতে ভাসিয়ে দে। সাঁতার না জানলেও এটা করতে অসুবিধা হলো না। আর তারপর আরও ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে দিলাম জলে। সামনে থেকে ধেয়ে এসে আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদীর শীতল জল। ডানপাশে জঙ্গল, এতোই কাছে যে কোথাও কোথাও জলে ছায়া পড়েছে তার। বাঁ-পাশ দিয়ে সেই সরু রাস্তা আর ছবির মতো কিছু কটেজ। এছাড়া শুধুই ধানি জমি। কচি-গাঢ় সবুজের কার্পেট। আরো দূরে আবছা হয়ে যাওয়া পাহাড়ের ছায়ায় ছোট গ্রাম - এ দৃশ্যকল্প স্বপ্ন ছাড়া আর কী! বেলা বাড়ছে, মাথার ওপর সূর্য, এবার ওঠা যাক। জল থেকে উঠে আসছি হঠাৎই মাথায় এলো ফটোসেশান করার। এমন মার্ভেলাস ব্যাকড্রপ আর ডেইজি, র‍্যাচেলের মতো মারকাটারি মডেল থাকতে এ-সুযোগ হেলায় যেতে দেওয়া যায় না। নিমেষে মূর্তির জলে বয়ে গেল আরও আধ-ঘন্টা।

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার গাড়ির সামনে জড়ো হয়েছি। মাঝের সিটের জানলার ধারে বসা নিয়ে র‍্যাচেলের সঙ্গে ব্রুনির তুমুল ঝগড়া বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। ওরা একে অপরকে 'বেগুনি জেলিফিশ', 'অক্টোপাসের ডান-বগলের ঘা' ইত্যাদি বলে গালাগালি দিতে থাকল। আমি হাল্কা মনে আবার পেছনের সিটে গিয়ে বসলাম চোখে রোদচশমাটা দিয়ে। গন্তব্য গরুমারা।

এর পরপর বেশ কিছু 'জানি না কেন' ঘটনার অবতারনা হবে। গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের টিকিট কাউন্টারে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর আড়াইটে। সকাল ৬ টা থেকে দফায় দফায় গরুমারা জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার টিকিট পাওয়া যায়। দুটোয় এক রাউন্ড জঙ্গলে ঢুকে গেছে। এখানকার নিয়ম মাফিক আমরা ঢোকার অনুমতি পাব বিকেল সাড়ে চারটে। এব্যাপারে সুখ আমাদের কিছুই জানায়নি আগে, 'জানি না কেন'! কিংকর্তব্যবিমুঢ় আমরা ঘ্যানঘ্যান করতে করতে পাশেরই এক অনামা চা-বাগান দেখতে গাড়ি ছোটালাম, 'জানি না কেন'! চা-বাগানের থেকেও বেশি উৎসাহ ছিল চা কিভাবে প্রোসেস হয় কারখানায় ঢুকে তা দেখার! সৌভাগ্যবশতঃ সেই কারখানায় সেদিন ছুটি ছিল, 'জানি না কেন'! দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন সিকিউরিটি গার্ড বসে আরেকজনের সঙ্গে গ্যাঁজাচ্ছিল। পড়ে গেল আমাদের খপ্পরে। বাহাদুর বা সজ্জন সিং সুবেদার নয়। না তার মোটা মোচ, না হাতে গাট্টা-গোট্টা লাঠি। স্থানীয় বাঙালি এক যুবকের সঙ্গে আমরা হিন্দিতে বাক্যালাপ শুরু করলাম, 'জানি না কেন'! যা-হবার তাই হোলো, নিয়মের পাক্কা মুখচোরা গার্ডটি বাধ্য হয়ে তার উর্দ্ধতন এক কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে এলো আমাদের দোরে দাঁড় করিয়ে। আর সেই ওপরওয়ালাটি অল্প কথায় আমাদের নিয়ে হাফ বন্ধ মিলটা পুরো ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন 'জানি না কেন'! শেষে তিনি আমাদের আগামীকাল আবার আসার অনুরোধ জানালেন, চালু মিল ভালো করে দেখিয়ে দেবেন। অথচ আমরা নিরুপায়। আমাদের আছে শুধু এই সময়টুকু। 'কবে-কখন-কোথায়-কেউ জানে না' ফিলোজফিতে জারিত আমরা ক'জন হই হই করে ঢুকে পড়লাম ফাঁকা চা-বাগানে। ঘুরে-ফিরে, দু-একটা ছবি তুলতে না তুলতেই আকাশের মেঘ গলে ফোঁটা ফোঁটা শুরু হোলো, আর আমরাও তড়িঘড়ি গাড়িতে ফিরে এলাম। আমরা গাড়িতে রেডি। ওমা! পল নেই। সামনেই রেঞ্জারের আফিস। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গেছে রেঞ্জারের সঙ্গে ভাব জমাতে। 'জানি না কেন'? ও ফিরে এলে চালক গাড়ির মুখ ঘোরালো গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের দিকে।

আমাদের ঢোকার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। মোষে টানা গরুর-গাড়িতে করে গরুমারা জঙ্গলে ঢুকলাম। প্রায় দেড় কিলোমিটার ভেতরে একটা পাকা ওয়াচ টাওয়ার। জঙ্গলের গভীর চৌহদ্দি শুরু এর পর থেকেই। এই ওয়াচ টাওয়ারটি আসলে জঙ্গলের হাতায়, জঙ্গলের ভেতরে নয়। তবু গিজগিজ করছে 'পাবলিক'। টেলি লেন্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় নিয়ে গিয়ে ক্যামেরায় চোখ রেখে দেখলাম নদীর ওপারে দুটো গন্ডার, গোটাচারেক সাদা বক। মনে হোলো গন্ডার দুটোকে যেন গলায় লম্বা দড়ি পড়িয়ে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে যেমন গরুকে চরতে দেওয়া হয়। আর সাদা বকগুলো গন্ডারের পিঠে চেপে পয়েন্টারের কাজ করছে। আধ ঘন্টা ওখানে কাটালাম। এর বেশি জঙ্গলে যাওয়া বারণ। এখন বর্ষাকাল। ফিরে আসছি দেখি আমাদের ফেরার পথের পাশেই দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঘাস-পাতা খাচ্ছে এক দাঁতাল। পায়ে শক্ত বেড়ি। একেবারেই পাত্তা দিতে ইচ্ছা করল না। ভাঙা মনের ওপর প্রলেপ দিতে, রুদ্ধ জঙ্গলের গা ঘেষে শুদ্ধ লোকনৃত্যের আয়োজন কালীপুর আখড়ায়।

দিনের শেষ সাফারির জন্য এই আয়োজন। শুনতে পেলাম, আগের সাফারিগুলোর প্যাকেজে লোকনৃত্যের বদলে পাওয়া যায় নদীতে বোটিং-এর সুযোগ! চা-বিস্কুট-ফটো-নাচ-জোঁক সহযোগে সে-পাঠ চুকিয়ে যখন ফেরতা পথে আমাদের গাড়ি, রিসর্ট থেকে চালক পাহাড়ির ফোনে বার্তা এলো, 'কাম শার্প! রিসর্টের কাছে নদীর ধারে হাতির পাল জল খাচ্ছে!' এরে কয় পোড়া-কপাল। ফিরতে ফিরতে ঝুপ্পুস অন্ধকার। আকাশ জলভরা মেঘে ভারি। রিসর্টের চৌহদ্দি ডুবে আছে লোডশেডিং-এ। খাওয়ার জায়গায় ব্যবস্থা করা গেছে কিছু টিমটিমে LED ল্যাম্পের। ম্যানেজারের ইন্তেজামে সেই সন্ধের জল-খাবারে উৎকৃষ্ট মোমো। তবে আমাদের আকর্ষণের বিষয় ছিল মোমোর সঙ্গের পাহাড়ি এক বুনো লঙ্কার চাটনি। স্যামকে যতদূর জানি, দেশ-বিদেশের বহু প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চল ওর চষা কাজের সূত্রে। শেষবার মনিপুরের জিরিবামে কাটিয়ে এসেছে টানা পাঁচ মাস। দারুণ উৎসাহে ও চাটনি চেটে চেটে খাচ্ছিল আর ওর দু-চোখ দিয়ে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ঝাল। আমাদের বারবার বারণ, র‍্যাচেলের হাড়-হিম করা ভ্রুকুটি, কিছুই যেন স্পর্শ করছিল না স্যামকে। এক জান্তব উল্লাস লক্ষ্য করছিলাম ওর চোখ দুটোয়। অল্প আলো আর অনেকটা আঁধারী, বাইরে গুরু গুরু মেঘ আর ঝোড়ো হাওয়ার আভাস - এসবই, নেহাতই এক ঘরোয়া

পরিবেশের ওপর অচিরেই বিছিয়ে দিল এক গা-ছমছমে জংলা গন্ধ-মাখা শিরশিরানি। যা, একটু আগে জঙ্গলের ভেতর গিয়েও টের পাইনি। আমাদের আল্গা, অতি মৃদু এতোল-বেতোল কথার আলুনিতে একমাত্র স্থির জ্বলজ্বল করতে থাকল স্যামের চোখ দুটো। এই আবেশেই সন্ধে গড়ালো রাতে। মূর্তিতে শেষ রাত। পল একবার প্রস্তাব দিল ক্যাম্প-ফায়ারের। বৃষ্টি আসতে পারে বলে নিরস্ত করলাম ওকে। যদি বলতাম, ম্যানেজার বলছে কাঠ জোগাড় নেই এবং জোগাড় করতে হলে পাশের জঙ্গলে যেতে হবে, তাহলে ওকে আর আটকানো যেত না। কী জানি, কোয়াক-কলিনের মধ্যে কাল সকালে একজনকে না পাওয়া গেলেও অবাক হতাম না। যাই হোক রাতের খাওয়া শেষ করে ঘোর-লাগা মানুষের মতো শরীরটাকে টেনে বিছানায় নিয়ে গেলাম।

সে রাতে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম এক। স্বপ্ন কখনই এত সাযুজ্যপূর্ণ, এত ঠাস বুনোটের হয় কি! এই রাতটুকুই তো শেষ এই মায়াময় মূর্তিতে। মজার ব্যাপার, স্বপ্নটা শুরুই হোলো আমাদের অপূর্ণ সাধ পূরণ করে। বুজে আসা চোখের ভেতর মায়াবী যবনিকা সরতেই দেখতে পেলাম রিসর্টের হাতায় ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা হয়েছে। চড়্ চড়্ করে পাখসাট মারছে আগুন। ফট্ ফট্ শব্দে শুকনো কাঠ ফাটছে। গোটা মোরগাটাকে তরিজুত করে ঝলসাচ্ছে স্যাম, আর জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ব্রুনি। দক্ষ হাতে শিঁকে বেঁধা মাংসপিন্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে স্যাম আর ব্রুনিকে বোঝাচ্ছে ঠিক মতো মাংস ঝলসাতে পারা একটা আর্ট, চট্ করে হয় না। এ-কাজে বিস্তর সময় দিতে হয়। তা নাহলে ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে। স্বাদ আসবে না। ব্রুনি বলে উঠল, 'তাই তো চিরে চিরে দিতে বলছিলাম। আর লেবুর রস কি মাখিয়ে মাখিয়ে ঝলসায়, না শেষে?' তেমন ঠাণ্ডা নেই তবু আমি আরও একটু কাছে সরে বসলাম আগুনের। যেন তাত এসে লাগল গায়। ভালো লাগল। পল, ডেইজি ও র‍্যাচেল হাতে হাত লাগিয়ে আরও কাঠ জড়ো করে সাজিয়ে রাখছিল। এরই মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ভেসে এল। আবার সব চুপচাপ। সবাই ঘুরে তাকিয়েছি। শব্দটা এল কটেজগুলোর পিছনের অন্ধকার থেকে। পল সাবলীল হাঁটা লাগাল সেইদিকে। উঠতে যাচ্ছিলাম, আমায় হাত দেখিয়ে থামতে বলল। তারপরই মুছে গেল অন্ধকারে। বাকীরা শ্বাসরোধ করে তাকিয়ে আছি সেইদিকে। আড় চোখে দেখলাম স্যাম শিক থেকে মোরগাটাকে ছাড়িয়ে পাশে রেখেছে। হাতে ধরে আছে শিকটা। এর-ওর দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করে এগিয়ে দেখব ভাবছি, তখনই দেখি পল ফিরে আসছে, পেছনে এক ছায়ামূর্তি। আগুনের আলোর আওতায় এলে দেখলাম, আর কেউ না, সাক্ষাৎ চলমান অশরীরি, আমাদের ব্রো। সাদরে আমন্ত্রণ জানালাম ব্রো-কে, 'কাম্-অন, জয়েন আস'! ব্রো বসল আমাদের সঙ্গে কিন্তু মাংস ছুঁলো না। ব্রুনি ও র‍্যাচেল সামান্য পিড়াপিড়ি করতেই সাফ জানিয়ে দিলো, সে শাকাহারী, আমিষ খায় না। ঠিক তখনই আকাশ ফালা করে খেলে গেল নীল আগুন। কাছাকাছিই বাজ পড়ল কালা করে দিয়ে। দ্রুত শেষ করতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম সদ্য রোষ্ট করা তাজা মাংসপিণ্ড। তারই ফাঁকে পল খুব হাল্কা চালে কথাটা পাড়ল। প্রায় শোনা যায় না তার গলা - 'গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, আজ রাতে জঙ্গলে যাব।' কারোর মুখে কোনো কথা নেই। পল দ্রুত চোখ বোলালো সবার মুখে। তারপর যোগ করল, 'ব্রো থাকবে সাথে'। জমাটটা কিছুটা পাতলা হল। পল তাড়া দিল, 'আর দেরী নয়। লেটস্ মুভ!'

আকাশ তখন স্লেটের মতো। ক্ষনিকে ক্ষনিকে বিদ্যুতের খড়ি দাগ কেটে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাপা বুনো গর্জনে স্টার্ট নিল রাতের সওয়ারি। তারপরই গোলার মতো ছুটে চলল টান টান করে পাতা সরু রাস্তা ধরে। স্বপ্নের মাঝে পেরিয়ে এলাম মূর্তি নদীর ব্রিজ। আর সাঁ সাঁ ছুটে চললাম জঙ্গলে। স্টিয়ারিং হুইলে বেপরোয়া টাইগার হঠাৎই নিভিয়ে দিলো গাড়ির হেডলাইট। আর একটা মিশমিশে কালো চাদর যেন আগাপাশতলা মুড়ে ফেলল আমাদের - গাড়ি সমেত। দু'হাত দূরের কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না। টাইগারের এই স্বেচ্ছা অন্ধত্বের স্বেচ্ছাচার, ভয়ের উর্দ্ধে রোমাঞ্চের এক চরম সীমায় নিয়ে গেছে আমাদের প্রত্যেককে। গতির মাঝে থমকে আছি সবাই। আমি বসেছি ব্যাক সিটে। আমার মুখোমুখি ব্রো। ভাবলেশহীন মুখ। হাতে প্রায় ছোট-খাটো সার্চলাইটের সাইজের একটা টর্চ। মাঝে মাঝে দপ্ করে জ্বলে উঠছে পাশের জঙ্গলের দিকে মুখ করে। নিভে যাচ্ছে যখন, আরও কালো করে দিচ্ছে রাত। পেছনে তাকালে মনে হোচ্ছে দৈত্যাকার এক অন্ধকার কীট, এই জঙ্গল, আকাশ, এই চরাচর সমস্তটা গিলতে গিলতে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। দূর আসমান, প্রায় মেঘের কাছাকাছি উঠে গিয়ে সেখান থেকে দেখতে পেলাম সমস্তটা। আবছায়া আবছায়া দেখা যায় নিচে যতদূর, শুধু জঙ্গল, গাছগুলো যেন লোমশ দানব সব সার বেঁধে, ঝোলা কাঁধ, ঘাড় গোজা, ঝিমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঠেলা-ঠেলি করে এ-ওর ঘুম ভাঙ্গাতে চাইছে। তার মাঝখান দিয়ে নিকষ কালো চুলের মতো এক চেরা রাস্তা। আমাদের গাড়ি যেন ট্রাজিস্টারের কাঁটা। কে যেন অদৃশ্য অতিকায় কোনো নব্ ঘুরিয়ে চলেছে পাগলের মতো আর কাঁটা দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে অগুন্তি চ্যানেল পেরিয়ে পেরিয়ে। মনোমতো ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছে না তাই এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে চলেছে কাঁটা, শুধু বিরক্তিবোধক ঘস্‌ঘস্ শব্দ করে। হঠাৎ ঝপ্ করে নেমে গেলো বৃষ্টি আর আমার স্বপ্নও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল গাড়ির ভেতর। শুধু নামলো না, নামলো মুষলধারে! মাঝরাত্তির, গভীর জঙ্গল, তদুপরি প্রমাণ সাইজের এক জবরদস্ত দুর্যোগ - স্বপ্নকে দুঃসাহসিক প্লটে পাল্টে ফেলার সব উপাদান প্রস্তুত। বৃষ্টির তোড় ফেঁড়ে যতটুকু হেডলাইট ততটুকুই আমাদের থাকা, ঠিক ততটুকুই বর্তমান। বর্তমানকে পলকে অতীতের চৌহদ্দি পেরোতে দেখছি চোখ ফিরিয়ে তো সেইমাত্র ঢুকে পড়ছি ভবিষ্যতের চৌকাঠ পেরিয়ে। অকাতরে কালের হাতে সমস্তটা ছেড়ে দিয়েও স্বপ্নের গড়ান হোঁচট খেয়ে থমকে গেল, যখন চির-রহস্যময় সেই আঁধার থেকে আমাদের গাড়ির হেডলাইটের আলোর বৃত্তে ধরা পড়ল এক ভুপতিত মহীরুহ আমাদের চলার পথের এপার-ওপার দখল করে পড়ে আছে। আমরা সকলে কিংকর্তব্যবিমুঢ়! ব্রুনি, র‍্যাচেল, ডেইজি ও পাইলট টাইগারকে গাড়িতে রেখে আমদের রাস্তায় নামতে হল সামনে পড়ে থাকা গাছ সরানোর চেষ্টায়। সত্যি, আমার ক্ষমতায় থাকলে স্বপ্নটাকে এতটা দুঃস্বপ্ন হতে দিতাম না। আশপাশের ছোট ডালপালা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেই বোঝা গেল পুরো গাছ নয়, তবে বেশ বড় একটা গাছের ডাল। আমাদের পক্ষে তুলে সরানো অসম্ভব। চলমান অশরীরি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। আপাদমস্তক ঝুপ্পুস ভিজে যখন ভেবে চলেছি অতঃকিম্, চাপা গলায় ব্রো হিস্‌হিসিয়ে উঠল, 'সবাই গাড়িতে ওঠো, কুইক।' আমরা ঘাবড়ে গাড়িতে উঠে এলাম তড়িঘড়ি। সব কটা দরজা লাগিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পুরো গাছ হলে ধরে নিতাম ঝড়ে পড়েছে, কিন্তু একটা ডাল . . . দেখে মনে হোচ্ছে খুব বেশিক্ষণ হয়নি। টাইগার যেভাবে হোক বেরিয়ে চল্।' টাইগার তৈরি ছিল স্টিয়ারিং-এ। গাড়ির গর্জন খান খান করতে থাকল সেই দুর্যোগ রাতের জঙ্গল। সামনের চাকা দুটো পিষতে থাকল আড়াআড়ি পড়ে থাকা ডালটার ঝাড়ালো অংশ। তারপর একবার রাস্তা থেকে সামান্য ডাইনে একদিককার চাকা নামিয়ে সেই ডালের উপর দিয়েই চালিয়ে দিলো গাড়ি। পরের মুহূর্তেই পেছনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডালটা। গাড়ি আর ঝঞ্ঝার আওয়াজের লড়াইয়ের মাঝে আমরা মূক। শুধু ব্রো একবার বলল, 'দাঁতাল ছিল'। অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল স্বপ্নের এই জায়গায়। বলা যেতে পারে এক অনুভূতি শূণ্য আবস্থা। গতির মধ্যেও নিশ্চলতা অনুভব করছি। শব্দ শুনছি, কিন্তু শুনছি না কিছুই। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সপ্‌সপে ভেজা তবু অদ্ভুত ফুরেফুরে লাগছে। মনে হচ্ছে যেন ভেসে আছি। ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে সেঁধিয়ে চলেছি বিলকুল! ক্রমশঃ ঘাড়ের ওপর চেপে আসছে জঙ্গল। গাড়ির চাকার দাগ ধরে গতি বাড়িয়ে চলেছে টাইগার। কোথায় শেষ জানি না। এরই মধ্যে টালমাটাল পেরিয়ে এসেছি চওড়া চওড়া প্রাকৃতিক নালা, প্রায় চার/পাঁচটা। তুমুল বর্ষায় নালাগুলো সব ফুঁসছে। অথচ কিছুই যেন আমাদের আর ছুঁতে পারছে না! আমরা যেন এসবের বাইরে থেকে দূরে বসে স্বপ্ন দেখছি মাত্র! সচেতন ভাবে সবাই যেন বুঝে গেছে এটা!

সকালে ব্রুনির ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গল যখন, দেখি ঘামে বিছানা পুরো ভেজা। ব্রুনি অল্প শাসন করল, 'সহ্য করতে পারো না যখন খাও কেন অত?' বেরিয়ে দেখি ঝকঝকে সকাল। অ্যাতোটাই ঝকঝকে যে গতকালটা স্বপ্ন না হয়ে উপায় নেই। শুধু সকাল না, কাউকে দেখেই কিছু বোঝার উপায় নেই। পল আর স্যাম যেমন গৃহপালিতের মতো দুধ-চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খাচ্ছে, আর ডেইজি তার ক্যামেরায় কলিন ও কোয়াককে নিয়ে আদিখ্যেতা করছে। ব্রুনি ও র‍্যাচেল নিতান্তই সেই এক বস্তাপচা - না না, এরা কেউই আমার গতকালের স্বপ্নের চরিত্ররা নয়। আমি আস্বস্ত হয়ে আয়েশ করে বেতের চেয়ারটি বাগিয়ে, সামনে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলাম। সকালের জলখাবারের পরই মূর্তি ছাড়লাম। চললাম ঝালং হোয়ে রোঙ্গুর পথে। গেট পেরোবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম লনে তখনও গতরাতের ক্যাম্পফায়ারের ছাই। স্থানীয় সংবাদেও বৃষ্টি নিয়ে কোনো কথা বাড়ায় নি। তবু মনে হোলো, ভেজা মাটিতে থকথকে ছাইয়ের ওপর একঝলক যা চোখে পড়ল তা কি দেখার ভুল না হাতির পায়ের ছাপ!

বাকি সফরটা আমি আর এই মায়াজাল থেকে বেরোতে পারি নি। মূর্তি থেকে সকাল দশটায় বেরিয়ে রোঙ্গু পৌঁছতে হয়ে গেল দুপুর। মূর্তি থেকে খুনিয়া মোড় পেড়িয়ে চাপরামাড়ি রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছোটাল চালক পাহাড়ি। আমায় হতবাক করে দিল, গতরাতের স্বপ্নটার সাথে কী মিল চারিদিকের! রোঙ্গু খুব বেশি উঁচুতে নয়। তিন-সাড়ে তিন হাজার ফিট হবে। বাঁ হাতে ঝালংকে রেখে, ডান দিকে দলগাঁওয়ে থামলাম খানিক! গাড়ি থেকে নেমে কাদায়-পাথরে-ঘাসে মাখামাখি পায় চলা পথে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম এক খাদের ধার ঘেঁষে! পরিচয় হোল অদ্ভুত এক পাহাড়ির সঙ্গে! খাদের ধারে রেলিং দেওয়া দলগাঁওয়ের এই অনামী ভিউ পয়েন্টকে নানান বাহারী ফুলে ফুলে সাজিয়ে চলেছে এই মানুষটি গত দশ বছর ধরে! খুব অল্পেই ভাব হয়ে গেল। এক

খাবলা বুনো গাছের পাতা চটকে ব্রুনির হাতে দিয়ে বলল শুঁকতে! ব্রুনিকে মাইগ্রেন ভোগাচ্ছিল। আশ্চর্য, খানিক আরাম পেল! খাদের পায়ের পাতায় চুলের ফিতের মতো কুল কুল জলঢাকা। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে পাশাপাশি দু'একটা মেমোরি ক্লিক করতে-না-করতেই পেছনটা সাদা চাদরে ঢেকে গেল! পাহাড় বিহ্বল করে প্রতিনিয়ত। কুয়াশার দিকে পিঠ করে ফিরে এলাম গাড়িতে। জানি গন্তব্য অন্যত্র, তবু এমনই হয় বারবার; অকারণে আঘাটায় মন আটকে আটকে যায়!

রোঙ্গুতে যে পাহাড়ের কোলে আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম, তারই মাথায় চড়ে পেলাম এক বৌদ্ধ মন্দির। এখান থেকেও নীচে সরু ফিতের মতো জলঢাকা। পল মনে হয় মনে করিয়ে দিল, আমরা রয়েছি ভারতে, আর নদীর ও পাড়ে ওই পাহাড়টা ভুটান, বিদেশ! নদীর গভীরে গোপন তাদের আষ্টেপৃষ্টে ধরে থাকা হাতের কম্পনে আরো কিছুটা ছলকে উঠে বয়ে গেল জলঢাকা। সন্ধের আগেই নেমে এলাম। রাত পোহাতেই গোছগাছের পালা। বেলা গড়াতেই আরো নেমে এলাম। বিন্দুতে জলঢাকাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে সোজা চলে আসার কথা আমাদের জলপাইগুড়ি। তবে ডেইজির আবদারে একবার যেতেই হোলো ঝালং-এর কাছে। ঝালং একটি নিষ্পাপ শিশু, যার এখনও লিঙ্গভেদ হয়নি। সবে পাহাড় থেকে নেমেছে। গায়ে এখনও ঝরনা ঝরনা আতুড়। নির্বোধ ও নির্বাধ তরঙ্গকে শাসনে রাখতে জঙ্গলা পাহাড়ের ব্যাকড্রপের সঙ্গে মানানসই ছোট-বড় পাথরের রাস্তা। আমি দাঁড়িয়ে আছি যেখানে, সামনে দেখছি যা, তা যদি সাজানো জলছবি হয়, তাতেও কোনো খেদ নেই, শুধু অনুরোধ আমার ঘোর কাটিয়ে দিও না। তবে ডেইজি শুনলে তো। হিড়হিড় করে নিয়ে গেল ঝালং-এর পাড়ে, আর তারপরই ঝাঁপ। 'সাঁতার জানি না' বলে চেঁচিয়ে কোনো ফল হবে না জানি, উত্তর আসবে 'এখানে সাঁতার জেনেও কোনো লাভ নেই'। সত্যি তাই। শিশুর মতো সরল হলে তার নিষ্ঠুর হতে আটকায় না, ঝালংও তাই। তবে আমার ওই একটাই ভরসা, সবটাই তো স্বপ্ন, আর আমার স্বপ্নে আমি মরে যাব না নিশ্চয়ই। আর গেলেও শুধু ঘুমটা ভাঙ্গবে না, এই তো!

কিন্তু না, ঘুম সেই ভাঙ্গলোই। ঝালং থেকে টেনে তুলে ডেইজি যখন আমদের রাতের ট্রেনে জলপাইগুড়ি থেকে সি-অফ করছে, তখন ভিড়ে, শব্দে, ব্যস্ততায় স্টেশন চত্তর থেকে খুব সংগোপনে স্বপ্নের লক্ষ্মণগুলো লোপাট হোতে থাকল। জাস্ট হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকল সুখ, চালক পাহাড়ি, ব্রো - অনেক রাতে, সবাই যখন যে যার বার্থে ঘুমঘুম, জানলা দিয়ে বাইরের নিকষ অন্ধকারে দেখলাম যেন, একটা সাদা ঘোড়া, পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে সমানে। পিঠে জিন। বেপরোয়া কেশরের সাথে সাথে পড়ানো লাগামটাও ছটফট করছে! অথচ কোনো সওয়ারি নেই! ঘোড়াটা ছুটেই চলেছে, সমান তালে . . . ।

~ ড্রয়ার্সের তথ্য~ ড্রয়ার্সের আরো ছবি ~

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারী কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনওবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকা বা টুকিটাকি হাতের কাজে ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

সান্দাকফুর টানে

শাশ্বতী ঘোষ

~ সান্দাকফুর তথ্য~ সান্দাকফু ট্রেক রুট ম্যাপ~সান্দাকফুর আরো ছবি ~

অনেক দিন একসঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় নি।
হঠাৎই সব ঠিক করে এবছর সরস্বতী পুজোর দিন বেরিয়ে পড়েছিলাম সদলবলে - সম্পূর্ণ পারিবারিক ট্রেকিং দল - আমি, দিদি (বেদাতী), জামাইবাবু (শঙ্খশুভ্র), বোন(অদিতি) আর ভগ্নিপতি (সুদীপ)। গন্তব্য বহু আকাঙ্খার সান্দাকফু।
৪ ফেব্রুয়ারী রাতে শিয়ালদহ থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস-এ যাত্রা করে পরদিন বেলা একটার সময়, প্রায় তিনঘণ্টা দেরিতে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম। নেমে দেখি আমাদের গাইড সান্তা কুমার তামাং সকালেই মানেভঞ্জন থেকে গাড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করে আছে। পরিচিতি পর্ব শেষ করে মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে রওনা দিলাম মানেভঞ্জনের উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি থেকে কিছুটা এগিয়ে গারিধুরায় কিছুক্ষণ জলখাবারের বিরতি। তারপর গাড়ি চলল পাহাড়ের দিকে।
পথের দুদিকে চা বাগান, সুন্দর চিত্রপট। একে একে ছেড়ে এলাম বিভিন্ন জনপদ। থারবো চা বাগানে আবার খানিকক্ষণের বিরতি। খুব সুন্দর থারবো চা বাগান। মিরিক ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে পথের পাশে সারিবদ্ধ পাইন গাছ। ছবির মত পথ ধরে বিকেল ৪-৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম মানেভঞ্জন। একটা বাঁধানো সরু নালা আলাদা করেছে ভারত আর নেপালকে। আমাদের সেদিনের আস্তানা হিমালয় হোটেল। পায়ে হেঁটে ছোট্ট মানেভঞ্জন ঘুরে, নালা পেরিয়ে নেপাল ছুঁয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।
ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ আমাদের পদব্রজে সান্দাকফু যাত্রা শুরু করার কথা। আমরা তৈরি, সকাল ৭টায় গাইড সান্তার আসার কথা। ঠিক ৭টায় গাইড এল কিন্তু সে তো সান্তা না! নতুন গাইড নিজের পরিচয় দিলেন রুদ্র ছেত্রী। জানালেন সান্তা তামাং-এর স্ত্রী অসুস্থ থাকায় যেতে পারবেন না তাই রুদ্রকে পাঠিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সান্তা নিজেই এসে সব বললেন। তাঁর স্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আমরা রুদ্রজীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম।

টুমলিং-এর পথে

মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব ৩১ কিমি। সিংগালিলা অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ। পারমিট করে নিয়ে যাত্রা শুরু। পাইন ঘেরা চড়াই পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে বিশ্রাম, তার সঙ্গে সুন্দর কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করা। দেড় ঘণ্টা পর পৌঁছালাম ৪ কিমি দূরে চিত্রে গ্রাম। চিত্রেতে জলখাবারের বিরতি। ম্যাগি, চা আর সঙ্গে আনা কেক সহযোগে জলখাবার ভালই হল। আবার যাত্রা শুরু। এখান থেকে চড়াই কিছু কম। কখনও ছোট গাছ আবার কখনও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। অনেক ওষধি গাছ বা গুল্ম এই পথে পাওয়া যায়। গাইড অনেক রকম গাছ আর গুল্ম দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন। বেলা ১১ টা নাগাদ এলাম মাত্র ৩-৪ ঘর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি লামেধুরা গ্রামে। আকাশ তখন মেঘে ঢেকে গেছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চললাম। দিদি ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে, মাঝে আমি আর বোন আর দুই জামাই একেবারে পিছনে। বেলা ১ টা নাগাদ পৌঁছলাম মেঘমাতে। মেঘে ঢাকা মেঘমা, এক হাত দূরের জিনিসও দেখা দুষ্কর। সেনাবাহিনীর শিবিরে সবার নাম নথিভুক্ত করিয়ে প্রবল শীতের মধ্যে চন্দ্র স্যারের দোকানে গিয়ে বসলাম। দু গ্লাস করে গরম জল খেয়ে মনে হল দেহে যেন সাড় এল। চা খেয়ে বসে রইলাম কিন্তু বাকিদের পাত্তা নেই। বেলা ৩ টে নাগাদ আমি আর দিদি আবার চলা শুরু করলাম। গাইডকে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করতে বলে এলাম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সেই মানেভঞ্জন থেকেই আমাদের সাথী একটা করে কুকুর। প্রথমটি চিত্রেতে এসে চলে যায়। চিত্রে থেকে অন্য একটা কুকুর আমাদের সঙ্গী হয়। মেঘমা থেকে সেও আমাদের গাইড। ঘন মেঘে ঢাকা পথ ধরে কুকুরটির পাশে পাশে ১৫-২০ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ মেঘ কেটে গেল, দেখি সামনে সুন্দরী টুমলিং। প্রথমেই পড়ল শিখর লজ, আমাদের দ্বিতীয় দিনের আস্তানা। খুব পরিষ্কার করে সাজানো। লজ থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা! অসাধারণ সেই দৃশ্য।

কালপোখরি

পরের দিন, ৭ তারিখের গন্তব্য হল কালপোখরি। সকাল ৭টা নাগাদ হাঁটা শুরু করলাম। রাস্তা মোটামুটি সুন্দর। বেলা ৯টা নাগাদ ৪ কিমি. দূরে জৌবারি পৌঁছলাম। ইন্দিরা হোটেলে মোমো আর চা খেয়ে আবার পথ চলা শুরু। এবার শুধু নেমে চলা উৎরাই পথে। দেখতে দেখতে চলে এল ২ কিমি. দূরের গৈরিবাস। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। এখান থেকে আবার শুরু হল দমফাটা চড়াই। আকাশ মেঘলা, তার সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম কাইয়াকাটা। দেহের উন্মুক্ত সামান্য অংশ মনে হচ্ছে যেন জমে যাবে। কাইয়াকাটার পর থেকে রাস্তা মোটামুটি সমতল কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট। যত এগিয়ে চলেছি মেঘের আনাগোনাও বেড়ে চলেছে। অবস্থা এমন হল যে এক ফুট দূরের জিনিসও মেঘে ঢেকে গেল আর ঝড়ের বেগে হাওয়া বইতে লাগল। দিদি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা গাইড এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের ধারে ঝরনার জল জমে রয়েছে। এক সময় পৌঁছে গেলাম কালপোখরি। কালপোখরি একটা ছোট হ্রদ যার জলের রঙ কালচে। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে সোজা হয়ে দাঁড়ানো দায়। আমাদের সেই রাতের আস্তানা ছুয়ান লজ। সন্ধ্যা ৭-৩০ টার মধ্যে রাতের খাওয়া শেষ করে লেপের ভিতর ঢুকে পড়লাম। রাত যত বাড়তে লাগল, হাওয়ার দাপটও ততো বাড়তে লাগল। চিন্তা শুরু হল সান্দাকফুতে এভারেস্ট দেখতে পাব তো? ঠাণ্ডায় ভাল করে ঘুমাতেও পারলাম না।

বিকেভঞ্জন

ভোর ৫ টা নাগাদ দেখি আলো ফুটেছে কিন্তু হাওয়াতে জানলা খোলা মুশকিল। অনেক কষ্টে জানলা সামান্য ফাঁক করে মন আনন্দে নেচে উঠল। বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ! তাড়াতাড়ি সুস্বাদু তিব্বতী রুটি, আলুর তরকারি আর জ্যাম দিয়ে প্রাতরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সান্দাকফুর উদ্দেশ্য। বিকেভঞ্জন (মানে বিষাক্ত উপত্যকা) পর্যন্ত পথ বেশ সুন্দর। বিকেভঞ্জনে চা খেয়ে আবার চলা শুরু। এবার শুধুই চড়াই। কিছুক্ষণ পর থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম, সিন্ডো, কাব্রু ও অন্যান্য তুষারাবৃত শৃঙ্গ। সিলভার পাইন ঘেরা পথ, নীল আকাশ আর তুষার ধবল শৃঙ্গরাজি - সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য! বেলা ১২-৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম বহু আকাঙ্ক্ষিত সান্দাকফুতে (মানে বিষাক্ত হাওয়ার দেশ)! পরিষ্কার আকাশ, কিন্তু শৃঙ্গগুলি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। প্রবল বাতাসের দাপটে রোদের মধ্যেও দাঁড়ানো দায়। বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে!

আমাদের আস্তানা হোটেল সানরাইজ। এই পথে একটা মজার ব্যাপার হল পথ মাঝে মাঝে নেপাল দিয়ে আবার কখনও ভারত দিয়ে। আমাদের হোটেল সানরাইজ নেপালে কিন্তু সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট ভারতে! ৯ তারিখ ভোর পাঁচটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর প্রবল হাওয়া উপেক্ষা করে চলে গেলাম ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যোদয় দেখতে। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সামনে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি কোণে হিমালয়ের অসংখ্য শৃঙ্গরাজি। বাঁদিকে খুব সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে তিন বোন (Three sisters - Lhotse, Mt. Everest, Makalu) - লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু! একেবারে সামনে সমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা সোনালি হয়ে উঠল। অসাধারণ সে দৃশ্য যা ক্যামেরায় ধরা যায় না, মনের মণিকোঠাতেই একমাত্র বন্দী করে রাখা যায়। সোনালি শৃঙ্গেরা ধীরে ধীরে রুপোলি হয়ে উঠতে লাগল ...

এবার ফেরার পালা। ফেরার পথ গুরদুম হয়ে সিরিখোলা। বেলা ৮-৩০ নাগাদ নামা শুরু হল। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খাড়া উৎরাই পথে নেমে চললাম। প্রচণ্ড হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ার আওয়াজ জঙ্গলের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছে বার বার। আর কোন শব্দ নেই। প্রায় ৫ কিমি. পথ পেরিয়ে এসে একটা সমতল জায়গায় একটু বিরতি। দেখা হল ইজরায়েল থেকে আসা এক দম্পতির সঙ্গে। ওঁরা গুরদুম দিয়ে সান্দাকফু যাবেন। আবার চলা শুরু । প্রায় ৭০ ডিগ্রি খাড়াই পথ দিয়ে শুধু নেমে যাওয়া। দেখতে দেখতে ১৪ কিমি. দূরের গুরদুম চলে এলাম বেলা একটা নাগাদ। একটা লজ সামনে পড়ল। সেখানে ডিমের অমলেট, চা আর কেক খেয়ে খানিক বিশ্রামের পর আবার শুরু হল পথ চলা। পাথরে বাঁধানো পথ। যেন আরও বেশি খাড়াই। এই পথে হাঁটা মনে হয় বেশি পরিশ্রমের। দূরে নীচে চোখে পড়ল খুব সুন্দর ছবির মত তিম্বুরে গ্রাম। পথ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। মাঝে মাঝে কিছু বুনো ফুল ফুটে রয়েছে। দু একটা গাছে লাল রডোডেনড্রন ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর জলের শব্দ কানে এলো। সিরিখোলার বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। বুঝলাম পথ শেষ হয়ে আসছে। বিকেল ৪টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম সিরিখোলার ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে কিছুটা দূরে রাতের আস্তানা হোটেল শোভরাজে। একদিনে নেমে এলাম প্রায় ১৯ কিমি. পথ। শেষ হল আমাদের চার দিনের পথ চলা।

সিরিখোলা থেকে পরদিন, ১০ তারিখ, গাড়িতে নিউ জলপাইগুড়ির পথ ধরলাম। ছবির মত অপরূপ পথ দিয়ে গাড়ি চলল। পথে পড়ল সুন্দর,সাজানো সব গ্রাম। ধোতরে এসে দেখি পরিষ্কার নীল আকাশ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা! থমকে দাঁড়ালাম শেষ বারের মতো। আবার এগিয়ে চলা।

ক্রমশ পেরিয়ে গেল চেনা মানেভঞ্জন, মিরিক...

ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল পাইনের বন, চা বাগান।

~ সান্দাকফুর তথ্য~ সান্দাকফু ট্রেক রুট ম্যাপ~সান্দাকফুর আরো ছবি ~

পেশায় সফটওয়্যার প্রফেশনাল শাশ্বতী ঘোষ একটি বেসরকারি সংস্থাতে ম্যানেজার পদে কর্মরত। ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসেন ভ্রমণ কাহিনি পড়তে। বড় হয়ে ভ্রমণ আর ট্রেকিং-এর আকর্ষণে ঘুরেছেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। এছাড়াও বই পড়া, গান শোনা, ছবি তোলা তাঁর নেশা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অযোধ্যা কাণ্ড

লোকেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী

অযোধ্যা পাহাড়ের তথ্য

শীতের এক কাকভোরে, খুবই কষ্ট করেই ঘুম থেকে উঠে, লুমু গাড়ি চালিয়ে গিয়ে আমাদের সংরক্ষিত বাসের চালক ও পথপ্রদর্শককে জাগিয়ে রওনার জন্য তৈরি থাকতে বলে এল। ইংরেজি প্রবাদে বলে, নরকের রাস্তা বাঁধান হয় সদুদ্দেশ্যের শানপাথর দিয়ে। অর্থাৎ, লুমু প্রথমেই নিশ্চয় এমন কিছু অমঙ্গলসূচক অযাত্রা করেছিল, যার ফলে যেতে আর আসতে দুদিকেই আমাদের দুর্দশার শেষ ছিল না। বাসে ওঠার পর প্রথমেই জানা গেল, সড়কপথে ওই বাস কোথাও ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটারের বেশি যেতে পারে না। বুকিং-এর সময় বাস মালিক সগর্বে শুনিয়েছিল, তার এই বাস নিয়ে, এই চালক ও পথপ্রদর্শক নাকি বহুবার পুরুলিয়া গেছে, এসেছে। ক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে কোলাঘাট এসে গেল, শনিবারের বারবেলাও পড়ে গেল, আবিষ্কার হল, চালক বা পথপ্রদর্শক কস্মিনকালে সল্ট লেকের বাইরে পদার্পণ করেনি, তারা শুধুই সল্ট লেকের মধ্যে বাসে করে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে গেছে, ফেরত এনেছে! কোনমতে গুড় গুড় করে আরও খানিকটা পথ পেরিয়ে অবশেষে দিবা দ্বিপ্রহরে এক জনহীন প্রান্তরের মাঝে বাস ঝিমিয়ে পড়ল। কি ব্যাপার? না, টায়ার ফেটেছে।

সেই অসহনীয় বাস

স্থবির বাস থেকে নেমে কেউ কেউ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল। মেরামতির পর গতিবেগ একটু যেন বাড়ল। পাঁচলা, বাগনান, গড়বেতা, বকদহ, ওন্দা, বিশপুরিয়া, সিরকাবাদ ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলল। শেষপর্যন্ত রওনা দেওয়ার ১০ ঘণ্টা পরে অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছান গেল। প্রথম গীয়ারে দিয়েও বাস পাহাড় বেয়ে উঠতে তো পারলই না, বরঞ্চ কয়েকবার বিফল চেষ্টার পর পিছন দিকে গড়াতে লাগল। হ্যান্ডব্রেক মেরে, চাকার পিছনে কাঠের গুটকা গুঁজে সমবেত প্রচেষ্টায় বাসের পিছন দিকে গড়ানো কোনোমতে রোখা গেল। বাজে রাত ৮টা। কেউ কেউ বাস থেকে নেমে পড়ল। বাসে আলোও নেই। অনেকের স্যুটকেসেই টর্চ আছে, কিন্তু সেগুলো বাসের পিছনে স্তূপ করে রাখা আছে, আলো না জ্বাললে খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় নেই। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাতাস হিমশীতল। আকাশে অভূতপূর্ব সুন্দর লক্ষ তারার উজ্জ্বল নামাবলী। চারিদিকের জঙ্গল গায়ে কাঁটা দেয়। এটা 'জনযুদ্ধ' সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত এলাকা, উপরন্তু নাকি পরিযায়ী হাতিদের যাতায়াতের রাস্তা...

নাহ্‌, জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়নি। একটা ট্রেকার পাহাড় বেয়ে নেমে আসছিল। সেটা ধরে, ন্যাড়া আর বুড়ো নিকটতম লোকালয়ে পৌঁছে অন্য কয়েকটা ট্রেকার ধরে আনল। আমরা সেগুলোতে ভাগাভাগি করে পৌঁছালাম সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের পর্যটক আবাসনে। আমাদের মূল সংগঠক ন্যাড়া ও বুড়ো গেল আমাদের নির্দিষ্ট ঘরগুলোর দখল বুঝে নিতে, দীপ ও লোকেন রইল পর্যবেক্ষণের জন্য বাগানে দাঁড়িয়ে। অচিরাৎ সশব্দে একদল রোগা রোগা স্থানীয় মানুষের উদয় হল, ছেঁড়া ন্যাতা কানিই তাদের একমাত্র শীতবস্ত্র। কারও কারও সঙ্গে সাঁওতালী ধামসা, মাদল, কাঁসর, বাঁশী ইত্যাদী। জানা গেল, এরা স্থানীয় সাংস্কৃতিক দল, যদিও মেয়েদের পরনে রঙিন পাড় সাদা শাড়ি নয়, তাদের পরনে শতছিন্ন ফ্রক মাত্র। দারিদ্রের দুর্দশা অতি প্রকট, কিন্তু দলটিতে হাসি ও আনন্দের কমতি নেই। এই অতিথিশালারই অন্য কোন দল এদের ভাড়া করে এনেছে। অতিথিশালার ছাদে কয়েকটা অত্যুজ্জ্বল বিশাল আলো জ্বলে উঠল। গাছের ছায়ার জন্য বাগানের মাটিতে জেব্রার গায়ের মত আলো আঁধারির এক অদ্ভুত সাদা কালো ছোপছোপ। ভারতীয় জাতীয় অভ্যাসমত কিছু প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার পর শুরু হল সাঁওতালী নাচ। গেঁয়ো গন্ধ গায়ে মাখা কাঁসি, বাঁশী, ধামসা, মাদলের তালে তালে সে নাচ অতি মনোহর। খানিকক্ষণ সেই আকর্ষণীয় নাচ চলার পরে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'আগন্তুক' সিনেমা দেখা অত্যুৎশাহী কিছু শহুরে

সাঁওতালি কুঁড়ের আঙিনায় লাল তুলসীর মঞ্চ

মহিলা তাতে যোগ দিলেন। আর তখনই ব্যাপারটা গেল কেঁচে। তাঁদের কেউ কেউ সালওয়ার কামিজ পরা, কনুইয়ে ঝুলছে ভ্যানিটি ব্যাগ। এমন অসংলগ্নতার হাস্যকর দৃশ্য কমই দেখা যায়। সাঁওতালী নাচের স্বাভাবিক ছন্দ গেল ভেঙ্গে। তাঁদের কতিপয় পুরুষ সঙ্গী হ্যান্ডিক্যাম বার করে সোৎসাহে সেই বিদঘুটে ভগ্নছন্দ নাচের ছবি তুলতে লাগলেন। গাছের তলার ঘন অন্ধকারে আর ছাদের তীব্র আলোর মাঝখানে তাঁরা কী ছবি তুললেন সেটা তাঁরাই জানেন। সেই ব্যর্থ প্রয়াস খানিকক্ষণ দেখার পরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্থান করলাম।

রাতের আকাশ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, শহরের মত আলোকদূষণ এখানে নেই। লক্ষ তারা চেয়ে আছে। তারা আর ত্রয়োদশীর চাঁদ মিলিয়ে যা আলো দিচ্ছে, তাতে অতিথিশালার আলোবিহীন পথগুলোতেও হেঁটে যেতে অসুবিধা হচ্ছে না। আমাদের বিরাট দলের জন্য একটা ডরমিটরি নিয়েছিলাম। তৎসত্ত্বেও আরও দুটো ঘর নিতে হয়েছিল। সে দুটো আবার অন্য বাড়িতে পড়েছিল। আড্ডার জন্য সবাই ডরমিটরিতেই জমায়েত। ডরমিটরির সামনের ছোট বারান্দায় এক

কুটীরগুলির দেওয়ালচিত্র

পাল কুকুর আমাদের লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেভাবে ঘরে ঢুকেই খাটগুলোর তলায় শুয়ে পড়ল, তাতে বোঝা গেল, এটা ওদেরই মৌরসি পাট্টা। বহু অনুরোধ উপরোধ করে, বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে তাদের পুনরায় বারান্দায় ফেরত পাঠান গেল। ক্রমে তাদের বোঝান গেল, তারা বারান্দায় থাকলে বিস্কুট, মাংসের হাড়, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর সবই পাবে, কিন্তু ঘরে ঢুকলে নয়। ডরমিটরির দেওয়াল আর অ্যাজবেস্টসের ছাদের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক। বাইরেটা হিলহিলে ঠাণ্ডা, পরে আবিষ্কার হল, রাতের তাপমাত্রা ছিল ৫° সেন্টিগ্রেড। বাতাস ছাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঘরটাকে অচিরাৎ সুমেরুর তাপমাত্রায় পৌঁছে দিল। তার মধ্যেই অভ্যাসমত চিত্রিতা ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে ফেলল। ছেলেপুলেদের উৎসাহে আর ঠাণ্ডা কাটাবার জন্য, ঘরের মধ্যে উদ্দাম নৃত্য শুরু হল, বাচ্চা থেকে বড় কেউই বাদ গেল না। কাছেপিঠে কেউ নেই, তাই নৃত্যের অনুসঙ্গ হিসাবে রেকর্ডারে তারস্বরে গান, বাজনা বাজালেও কারো কিছু বলার নেই।

পরদিন সকালে কিছু স্থানীয় অনুসন্ধানের পর এক 'Hill Top Hotel' আবিষ্কার হল। তারা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই আমাদের বিরাট দলের প্রাতরাশটা পরিচালনা করল। হোটেলের চেহারা যাই হোক, খাবার ভাল আর দাম এত ভাল, যে ন্যাড়ার মুখেও হাসি ফুটল। ঠিক হল, বাকি দিনগুলোয় এই হোটেলেই খাওয়াদাওয়া হবে। ভালো করে চা-টা খেয়ে, আমরা বেরোলাম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য কী কী আছে দেখবার জন্য। মনোহর সাঁওতালী গ্রাম, ধানের বীজতলা আর ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ দেখে যাত্রার যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে কুটিরগুলোর দিকে নজর পড়ল। কোনো কোনোটার দরজাই নেই। সামনে গরু, কুকুর ঢোকা আটকাতে আগড় দেওয়া, কোনোটাতে চ্যাঁচারির দরজা, দড়ি দিয়ে রাত্রে বাঁধা থাকে। কুঁড়ের বাইরে চালের নীচে দুটো করে বাঁশ আড়াআড়িভাবে বাঁধা, তার ওপরে কিছু মাটির হাঁড়ি আর বাঁশ থেকে সামান্য দু'একটা কাপড় ঝুলছে। গ্রামের রাস্তা, কুঁড়ের পাশে উঠোন সব একদম পরিষ্কার করে নিকানো, কোথাও কোন আবর্জনা নেই। কুঁড়ের ভিতরে উঁকি দিলে আশ্চর্য্য হতে হয়। ভিতরে কিচ্ছু নেই। এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর অনাড়ম্বর জীবন দেখে অবাক হলাম। লজ্জা হল, আমাদের জীবনে কত কিছুই না লাগে, এদের কিছুই নেই, কিছুই লাগে না। কয়েকটা কুঁড়ের চালের নীচে পোষা পায়রার জন্য সার দিয়ে কাঠের বাক্সের বাসা। যে পায়রাগুলো বসে পালক পরিষ্কার করছে, তাদের চেহারায় কোন অনাহারের চিহ্ন নেই, বরং বেশ কোঁতকা। হতে পারে, এই সব পোষ্য পায়রারা অসময়ে গৃহস্থের প্রোটিন-এর প্রয়োজনও মেটায়।

প্রিয় রেস্তোঁরার সামনে দলের মহিলারা রোদ পোহাচ্ছেন

তুঙ্গা বাঁধ, পুরুলিয়া

হাঁটার পক্ষে যে সব জায়গাগুলো একটু বেশি দূর, সেগুলো দেখার জন্য পরদিন সকালে দুটো ট্রেকার ভাড়া করা হল। দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল বামনী (ব্রাহ্মণী) জলপ্রপাত, তুঙ্গা জলপ্রপাত, তুরগা বাঁধ, বাঘমুণ্ডি ও সাহেব বাঁধ, বাঁধঘাটু ইত্যাদি। এখানে এক বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হতে চলেছে। দানবীয় সব মাটি কাটার যন্ত্র সগর্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতিকায় সব লোহার কাঠামো আর মোটা মোটা লোহার নল ঝালাই করে জোড়া দেওয়া হচ্ছে। নলগুলো পরে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। অযোধ্যা পাহাড়ে না ছিল কোন সাধারণ ফোন, না ছিল কোন সচলভাষের মিনার। এখানে দুইই আছে, সবাই তড়িঘড়ি ইতিউতি ফোন সারতে লাগল। দূর থেকে ময়ূর পাহাড়ের উচ্চতা দেখে সেটা বেয়ে ওঠার শখ মিটে গেল। গড়জয়পুরও যাওয়া হল না, যদিও বুড়োর বেড়ানোর ফর্দ্দের মধ্যে তার নাম ছিল। ফেরবার পথে আমরা চড়িদা গ্রামে একটু থামলাম। কেউ কেউ ছৌ নাচের মুখোশ কিনল। ডরমিটরিটা বড্ড ঠাণ্ডা বলে সেটার বদলে শেষের রাতে আমরা বড় বাড়িটায় কয়েকটা ঘর নিয়ে নিলাম। ঘরগুলো অত বেশী ঠাণ্ডা নয়। পরের দিন সকালে একটা ট্রেকার এসে, কয়েক খেপে মালপত্র শুদ্ধ আমাদের অযোধ্যা পাহাড় থেকে সিরকাবাদে নামিয়ে আনল। সিরকাবাদে আমাদের সেই কুখ্যাত বাস অপেক্ষা করছে, সেটা নাকি এর মধ্যে সারানো হয়েছে!

যাত্রা শুরু হতে না হতেই বাস আবার কেতরে পড়ল। সৌভাগ্যবশত সামনেই এক গ্যারাজ, যদিও অতি পাতি। মেরামত শেষ হবার আগেই আবিষ্কার হল, কাছেই এক মেলা চলছে, যেখানে সস্তায় বালুচরী আর স্বর্ণচরী শাড়ি বিক্রি হচ্ছে। উদ্বিগ্ন ন্যাড়া এক চোখ রাখছিল গাড়ি সারানোর উপর, আরেক চোখ মহিলাদের উপর, যাতে তাঁরা না মেলার দিকে পালান। ব্যাপারটা কেঁচিয়ে দিল বরুণ। কোত্থেকে ঘুরে এসে চাউর করল, কাছেই অনেক ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়ে আছে, প্রদর্শনীর মাঠ মাত্র ১০ মিনিটের পথ, ভাড়া ৩ টাকা। বুড়ো চেষ্টা করল, যাতে কথাটা ঘুরে যায়। সামনেই নারকোল গাছ থেকে কয়েকটা ঝুলন্ত বাবুই পাখির বাসা দেখিয়ে তাদের বাসা তৈরির অপূর্ব শিল্পশৈলীর প্রশংসা করে এক দীর্ঘ ও বিজ্ঞ ভাষণ শুরু করল। বাস্তবানুগ বর্ণনার খাতিরে, বুড়ো একটা পাখির বাসার খোঁজ শুরু করল। মাটিতে পড়া একটা থ্যাঁৎলানো বাসা পেয়ে লোকেন সন্তর্পণে তার একটা শুঁয়ো ধরে তুলে এনে বুড়োকে উপহার দিল। দু হাতে সেটাকে ভাল করে ধরে, বুড়োর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বিগুণ উৎসাহে চলল। যখন প্রকাশ পেল, ভাঙা বাসাটা মাটিতে কুকুর ও মনুষ্য মূত্রের কাদায় এতক্ষণ পড়ে ছিল, তখন প্রবল গণ আন্দোলনের ফলে বুড়ো সেটা বর্জন করতে বাধ্য হল। এর মধ্যেই কিছু মহিলা মেলায় চলে গিয়েছিলেন। সুবিধামত কিছু না পেয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে তাঁরা ফিরে এলেন। আবার নতুন উদ্যমে বাস রওনা দিলে রাত পৌনে বারটা নাগাদ আমরা কলকাতায় বাড়িতে পৌঁছালাম।

ছৌ নাচের মুখোশ

অযোধ্যা পাহাড়ের তথ্য

চাকরিজীবনের শেষে আপাতত অবসরই পেশা লোকেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরীর। আর নেশা বেড়ানো, বই পড়া, ছবি তোলা, কলেজ সহপাঠীদের সঙ্গে আড্ডা মারা।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

হাম্পি - পাথর আর গ্রামের গল্প

দোলা দত্তরায়

~ হাম্পির তথ্য ~ হাম্পির আরো ছবি ~

পাথরগুলো সব অদ্ভুত দেখতে - কোনও কোনওটা একে অন্যের ওপর এমনভাবে বসে যেন এখনই গড়িয়ে পড়বে হুড়মুড়িয়ে - সব কিছুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে। আশ্চর্য লাগছিল দেখে যে এখানকার লোকেরা তাদের শান্ত গ্রামের আশেপাশে এইসব ভয়ঙ্কর পাথরের মাঝেই সাহস করে গড়েছে মন্দির আর উপাসনাস্থল। পাথর, পাহাড় আর প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপের এই রাজ্যে আমরা পৌঁছেছিলাম কিছুদিন আগেই। হাম্পি ভ্রমণের সাম্প্রতিক এই অভিজ্ঞতা এককথায় অসাধারণ।

দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পি রয়েছে ইউনেস্কোর 'বিশ্বের বিস্ময়'-এর তালিকায় - একদা শক্তিশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতীক তার স্মারক স্তম্ভ আর রাজপ্রাসাদগুলির ভগ্নাবশেষ আগলে আজও জেগে।

ভূগোলের দৃষ্টিতে জায়গাটা বৈপরীত্যে ভরা। আমাদের গন্তব্য ছিল ছোট্ট গ্রাম আনেগুণ্ডি, পথের একপাশে রুক্ষ লাল মাটি - শুধুই বড় বড় পাথর আর বোল্ডার, অন্য পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের খেত, মাঝে মধ্যে আখের ঝাড় আর নীল আকাশের নিচে ঘন সবুজ গাছগাছালি।

আনেগুণ্ডি যেতে ফেরি করে পেরোতে হল 'তুঙ্গভদ্রা' বা পম্পার এক উপনদী - চওড়া পাড়ে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোও ভারী সুন্দর লাগছিল - যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়া মালা থেকে মুক্তোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। শুনলাম মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপগুলোর সংযোগের জন্য কংক্রিটের ব্রিজ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল - কিন্তু ২০০ মিটারেরও বেশি গভীর নদীতে সেটা ভেঙে পড়ে। ওপারে একটা অটো রিকশা আমাদের পৌঁছে দিল আনেগুণ্ডি গ্রামের ভিতরে।

পরিচ্ছন্ন ছোট্ট গ্রামের মাঝে কিষ্কিন্ধ্যা ট্রাস্ট পরিচালিত উরাম্মা হেরিটেজ হোমে পৌঁছে মন ভরে গেল। একসময় যেটা কোন ধনী ভূস্বামীর আবাস ছিল তা এখন সাজানোগোছানো সুন্দর এক অতিথিশালা। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ দলে দলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের টেনে আনতে শুরু করাতেই সময়ের সঙ্গে এই পরিবর্তন। আদপে এটা তৈরি হয়েছিল একটা পরিবারের বসবাসের জন্য - দুটো শোওয়ার ঘর - সংলগ্ন পশ্চিমি কেতার স্নানঘরসহ, একটা বড় বসার ঘর, বারান্দা আর পিছনদিকে ছোট রান্নাঘর। ছাদে ওঠার সরু সিঁড়িতে রেলিং নেই - একদিকে দেওয়াল - কেউ কেউ হয়তো তাতে একটু ঘাবড়ে যেতে পারে। তবে এখানের ট্রাডিশনাল স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ অথচ আধুনিক সব ব্যবস্থা সারাদিন ধরে হাম্পিতে ঘোরাঘুরি আর পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা-নামা করে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এসে বিশ্রামের জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ।

উরাম্মা হেরিটেজ হোমের অদূরে ঘেরা জায়গায় রিসর্টের নিজস্ব খেত - সবজি, ফলের পাশাপাশি ধান, ভুট্টাও চাষ হয় সেখানে। জমির পাশে ছোট ছোট কটেজ - যারা প্রকৃতির একেবারে কাছে থাকতে চায় তাদের জন্য। ওখানেই কমন কিচেন আর ডাইনিং এরিয়া - সকালে আমরা প্রাতরাশ সারতে যেতাম। সুন্দরভাবে সাজানো আর নারকেল ও তালগাছে ঘেরা জায়গাটায় নানান পাখির কলতান - সারস, মাছরাঙা ছাড়াও দৌড়ে বেড়াচ্ছে হাঁস-মুরগির দল। এরপরে গ্রামের পথে হাঁটার সময় যখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিত 'পবিত্র' গরুবাছুরের পাল তখন আর বিন্দুমাত্র আশ্চর্য লাগত না। আসলে আমাদের কাছে কয়েকটাদিনের অন্যরকম এই অভিজ্ঞতাটা শুধু মনোরম বললে বড় কম বলা হবে।

গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ত পাথুরে চাতালে উবু হয়ে বসা গল্পে মগ্ন বৃদ্ধদের, কোথাও বয়স্ক মহিলারা বড় বড় বেতের চালাতে রাখা চাল থেকে পাথর বাছতে ব্যস্ত আর তরুণীরা ঝাড়া-পোঁছা করছে তাদের বাড়ির উঠোন - তারপর নবরাত্রির জন্য চকের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা দিচ্ছে। কেউবা ব্যস্ত ঘরের কাজে - গাছে টাঙানো দড়িতে ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে। শিশুরা খালি পায়ে খেলে বেড়াচ্ছে সারাদিন - এই ক'দিনেই আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তাদের উল্লসিত গলার 'এল্লো' আর 'বাই-বাই' শুনতে শুনতে। ছোটরাতো বটেই তরুণীরাও নিজেদের ছবি তুলতে ভারী আগ্রহী ছিল। নানারকম পোজ দিয়ে ক্যামেরার স্ক্রিনে দেখাটাই ছিল তাদের কাছে একটা মজার ব্যাপার। তারপর নিজেদের কাণ্ড দেখে নিজেরাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। একদিন কাছেই

এক রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপে উঁকি দিলাম আমরা - পুনর্গঠনের কাজ চলছে সেখানে।

স্থাপত্যবিদ আর পুরাতাত্ত্বিকের স্বর্গ হাম্পিতে বিঠল আর বিরূপাক্ষ মন্দিরের নজরকাড়া সৌন্দর্য, রাজকীয় এলাকার অবিশ্বাস্য বিশালতা, রানির স্নানাগার, এককালের প্রভূত ধনশালী বিজয়নগর রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তখনকার 'বাজার'-এর ছড়ানো ছেটানো নিদর্শন - এককথায় অসামান্য। পাথরের দেওয়াল, ছাদ, দরজা-জানলার ভগ্নাবশেষের সূক্ষ্ম কারুকার্য মুগ্ধ করেছিল আমাদের। বিরাট বিরাট সব মোনোলিথ - 'উগ্র নরসিংহ', বৃহত্তম 'শিব লিঙ্গ' এমনকী 'গণেশ'-এর মূর্তি সত্যি তাকিয়ে দেখার মতো। অবশ্য ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, ধুলো আর ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এইসব দেখা মোটেই সহজ কাজ হয়নি - কিন্তু তার জন্য কোনও আফসোস নেই।

তবে সবথেকে ভালো লেগেছিল - 'নবরাত্রি'তে আনুগেণ্ডি গ্রামের 'দশেরা' উদ্‌যাপন। গ্রামের প্রত্যেকে - ছোট থেকে বড় - নতুন পোষাকে সার দিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে - 'রামায়ণ' যাত্রা এবং হাতির পিঠে দেবী উরাম্মার মূর্ত্তি নিয়ে মিছিলের গ্রাম পরিক্রমা। দারুণ রঙিন, ঝলমলে আর সুন্দর এক অভিজ্ঞতা - স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের ট্রাডিশনাল পোষাকে নাচ।

স্থানীয় কিছু দোকানের আন্তর্জাতিক মানের খাবারের স্বাদও ছিল এককথায় অসাধারণ - এ বিষয়ে হাম্পি সত্যিই কসমোপলিটান। 'গোয়ান কর্নার'-এ ডিনার সারার কথাও মনে থাকবে চিরকাল। 'ম্যাংগো ট্রি'-র খাবার-দাবার-ও খুব ভাল আর জনপ্রিয়ও।

তিন দিন দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে কেটে গেল। কাছের শহর হসপেটে ফেরার জন্য নদীর বুকে ফেরিতে বসে ভেসে যেতে যেতে অনুভব করলাম সারাজীবন মনে রাখার মত কিছু স্মৃতিতে ভরে উঠেছে মনের মণিকোঠা।

অনুবাদ - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

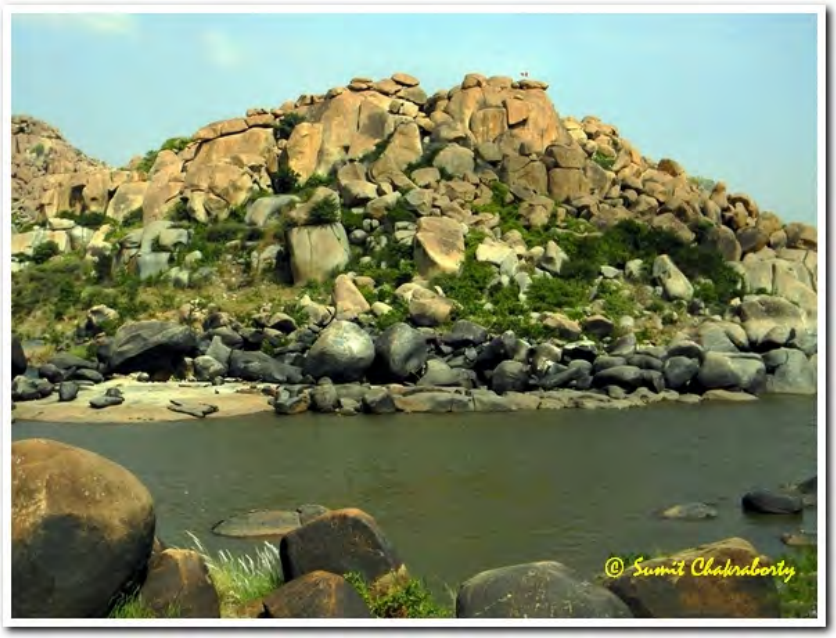

~ হাম্পির তথ্য ~ হাম্পির আরো ছবি ~

কলকাতায় জন্ম হলেও পড়াশনার সূত্রে দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী দোলা দত্ত রায়ের কলমে ইংরেজিই সহজাত। কিছুদিন কলকাতায় বিজ্ঞাপনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর বর্তমানে লেখালেখি, ছবি আঁকা ও ফটোগ্রাফিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

স্বর্গ দর্শন

তুহিন ডি. খোকন

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরো ছবি ~

স্বর্গ লাভের ইচ্ছে তো সবারই, কিন্তু ইহকালে এমন কোন পুণ্যকাজ করিনি যে স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ভূ-স্বর্গ দর্শনের দুর্বার ইচ্ছে বাস্তবায়ন করা গেল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। বিদেশ তো বটেই, তার উপর ঝুঁকি-বহুল এলাকা কাশ্মীর। যেখানে প্রতিনিয়তই কোন না কোন দুর্ঘটনা বা সশস্ত্র হামলা ঘটছেই। তবুও ভূ-স্বর্গ বলে কথা, আনাচে কানাচে যার লুকায়িত ঐশ্বর্যে ভরা।

কলকাতা থেকে জম্মু অবধি দুটি ট্রেনই আছে। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সময় নেয় হিমগিরি এক্সপ্রেস। সপ্তাহে মাত্র তিনদিন চলা এই ট্রেনের টিকিটও অনেকটা সোনার হরিণের মতো। যাই হোক একটু আগেভাগে প্ল্যান করাতে প্রায় দেড়মাস আগে এসি টু-টায়ারে ছয়টির মধ্যে চারটি কনফার্ম টিকিট পেয়ে গেলাম, বাকি দু'টি আর.এ.সি. থাকলো। আমার ইন্ডিয়ান ট্রাভেল এজেন্ট জানালো এই দু'টি টিকিট কনফার্ম হয়ে যাবে ভ্রমণের চব্বিশ-ঘণ্টা আগেই। আমাদের শুধুমাত্র অনলাইনে অথবা স্টেশনে গিয়ে চার্ট দেখে সিট ও বগি নম্বরটি জেনে নিতে হবে। টিকিট কাটার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেল আমাদের স্বর্গ দর্শনের প্রতীক্ষা.....প্রতীক্ষার প্রহর সত্যিই খুব যন্ত্রণাদায়ক।

নোমান,আমি এবং আমাদের পরিবার ইতিমধ্যে হিমাচল প্রদেশ সহ ভারতের বেশ কিছু দর্শনীয় জায়গা ভ্রমণ শেষ করেছি। ভ্রমণের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, আমরা ততই উত্তেজিত হতে লাগলাম। প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে গুছানো শেষে একদিন সত্যি সত্যি সোহাগ-পরিবহণের তথাকথিত স্ক্যানিয়াতে করে রওনা দিলাম কলকাতার উদ্দেশে। প্রথমদিন কলকাতায় রাত্রিযাপন শেষে পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই ছুটলাম ফেয়ারলি প্লেসে ফরেন কোটায় দিল্লি টু কলকাতা টিকিট কাটাতে। কেননা আমাদের যাওয়ার টিকিট কনফার্ম থাকলেও ফেরার টিকিট পাইনি পূজার ছুটির ভিড়ের কারণে। ভাগ্য ভালো যে ওই দিনের জন্যে মাত্র ছয়টি টিকিটই ছিল এসি -থ্রি টায়ারে ফরেন কোটাতে। ছ'টি টিকিটই কনফার্ম করলাম আমরা।

হিমগিরি এক্সপ্রেস। নামটি যেমন সুন্দর ট্রেনটিও তেমনি। কলকাতা থেকে জম্মুর দূরত্ব প্রায় ২০২০ কিলোমিটার। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা জার্নি শেষে যখন জম্মু রেল স্টেশনে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। স্টেশন থেকে বেরিয়েই মাথায় হাত। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে আছে, কিন্তু কোন গাড়ি যাচ্ছে না। প্রি-পেইড ট্যাক্সি কাউন্টারে খবর নিয়ে জানতে পারলাম আজ বনধ্। কোন গাড়ি শ্রীনগরে যাবে না। আমার দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি পৃথিবীতে দু'নম্বর ব্যবস্থা সবখানেই থাকে। তাই একটুও দেরী না করে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে বেরুলাম আমি আর নোমান। খানিক খোঁজাখুঁজির পর স্টেশনের পাশেই এক সরু গলিতে একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বলতে তারা মোটামুটি সহনীয় ভাড়াতেই আমাদের শ্রীনগর নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল। আপেলের ভরা মরসুম, তাই গাড়িতে ওঠার আগে খুব সস্তায় বিশাল আকৃতির আপেল কিনে বেলা সাড়ে তিনটায় রওনা দিলাম ২৯৮ কি. মি. দূরে কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। প্রায় ১৪ ঘণ্টা পাহাড়ি রাস্তায় জার্নি শেষে যখন শ্রীনগরে পৌঁছলাম তখন রাত দু'টো। মেক মাই ট্রিপ ডট কমে হোটেল রিজার্ভেশন আগেই করা ছিল। এই রাত দুপুরে হোটেলওয়ালাকে ফোন করতেই সে জানালো যে লোক পাঠাচ্ছে আমাদেরকে চৌদ্দ নম্বর ঘাটের সামনে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শুরুতেই যা খটকা লাগলো একটু পরেই সত্যি প্রমাণিত হলো তা। ওয়েবসাইটে হোটেলের ছবিতে হোটেলটির অবস্থান ডাঙাতে দেখালেও সত্যিকারে ওটির অস্তিত্ব বিখ্যাত ডাল-লেকের ওপাড়ে। শুনশান শীতল মধ্যরাতে প্রায় আধ-ঘণ্টা অপেক্ষার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার ডাল-লেক থেকে ভেসে এলো লম্বা জোব্বা পরিহিত বৃদ্ধ-তরীওয়ালার ডাক। ভয় লাগছিল স্বাভাবিকতই, যাই হোক বউ-বাচ্চা নিয়ে বিপদ-সংকুল কাশ্মীরের পথে পড়ে থাকার চেয়ে সেই ডাকে সাড়া দেওয়াই উত্তম মনে করলাম। লেকের ওপাড়ে গিয়ে দমে গেলাম হোটেল রুম আর টয়লেটের অবস্থা দেখে। রুমের মধ্যেই টয়লেটের ভেন্টিলেশন। এই মাঝ রাতে কিছু করার নাই দেখে কোনক্রমে রাতটি পার করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

রাত প্রায় তিনটের দিকে ঘুমালেও চিরাচরিত অভ্যাসের কারণে ভোর ৫ টাতেই ঘুম ভাঙলো। ট্র্যাকস্যুট ও কেডস পরে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু মেনল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে এই ভোরে কোথাও কোন পারাপারের ডিঙি তথা শিকারা দেখলাম না। পাশাপাশি সারিবদ্ধ হাউসবোটগুলোর হালচাল দেখে আবারও রুমে ফেরত এলাম। আটটার দিকে নোমানকে ডেকে নিয়ে মেনল্যান্ডে চলে এলাম একটা শিকারা ধরে। বউ-বাচ্চাদের নাস্তার ব্যবস্থা হোটেলে করে এলেও তখনও আমরা দু'জনের কেউ নাস্তা করিনি। ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে ব্রেকফাস্ট সারলাম ডিম ও মাখন-পাউরুটি দিয়ে, তারপর বেরুলাম স্থলভাগে হোটেলের সন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজির শেষে মেন রোড থেকে সামান্য ভেতরে "হোটেল মধুবন" কে একেবারে মনেপ্রাণে পছন্দ হয়ে গেল। বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের লন, সুদৃশ্য হোটেল দালান। নোমান কথা বললো হোটেল ম্যানেজার মেহেদী হাসানের সঙ্গে। প্রথমে ২৫০০ রুপি ভাড়া চাইলেও পরে সেটিকে আমরা প্রতিরাত ১২৫০ রুপিতে ম্যানেজ করলাম পাঁচ দিনের জন্যে। ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড থেকেই ১৬০০ রুপি দিয়ে হাফ-ডে সাইট সিয়িং এর ব্যবস্থা করলাম। আমাদের ড্রাইভারের নাম রিয়াজ।

কাশ্মীর ভ্যালিতে অবস্থিত শ্রীনগর শহরটির আয়তন ১৮১ বর্গ কিলোমিটার, স্থানীয় লোকসংখ্যা প্রায় দশ লাখের কাছাকাছি। সমগ্র কাশ্মীর তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনিতে ঘেরা - প্রথম স্তরে পুরোপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনী, দ্বিতীয় স্তরে আধা-সামরিক বাহিনী বিএসএফ ও তৃতীয় স্তরে কাশ্মীরি পুলিশ। প্রথম দেখাতেই অনেকেই ভড়কে যাবে মাত্রাতিরিক্ত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে। অবশ্য আমরা কাশ্মীরে পৌঁছানোর মাত্র দু'দিন আগেই আজাদ কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলারা একজন পূর্ণ কর্ণেলসহ সেনাবাহিনীর ৮ জন সদস্যকে হত্যা করেছে। ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন আরো কঠিনতম অবস্থায়। অবশ্য এর বিপরীতে যা দেখলাম তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। পুরো ভারতবর্ষসহ অনেক দেশ ঘুরলেও কাশ্মীরের বাসিন্ধা তা পুরুষ হোক আর মহিলা, এত রূপবান পুরুষ ও রূপবতী নারী আমি আগে কোথাও দেখিনি। প্রধানত: আবহাওয়াগত কারণে এদের স্বাস্থ্য, রঙ ও মেজাজ এতো ভালো। আমাদের পুরো

দলই কাশ্মীরিদের রূপ-মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

প্রথমেই আমরা গেলাম মোগল গার্ডেনে। পথে পথে পাইন সারির শোভাবেষ্টিত পর্বতমালা, তারই মাঝে অসংখ্য নাম না জানা ফুলের স্বর্গ, চারদিকে এতো রঙ যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পরের গন্তব্য শহর প্রান্তে পরিমহল। অনেক ওপরে অবস্থানগত কারণে নাগিন ও ডাল লেকের প্রান্তঘেষা মোটামুটি অর্ধেক শ্রীনগর শহরকে দেখা যায় এখান থেকে। প্রাচীন দুর্গের ফাঁকে ফাঁকে নানাবর্ণের অর্কিডের মেলা। এরপর নিশাত গার্ডেনে ভিড়লো আমাদের গাড়ি। তিনদিক থেকে পর্বতে ঘেরা এই উদ্যানের আয়তন বিস্তীর্ণ। দু'তিনশ বছরের বুড়ো মেপল ট্রি ও কৃত্রিম পানির ফোয়ারা এই গার্ডেনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা হলাম হযরতবাল মসজিদের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে গাড়িতেই খানিকটা ঝিমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু রসিক ড্রাইভারের উচ্চ-ভলিয়্যুমের অডিও আমার দিবানিদ্রার বারোটা বাজিয়ে দিল। কারণ জিজ্ঞেস করতে জানালো সে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে। হাজার হাজার কবুতর আকাশ অন্ধকার করে উড়ছে। তার আড়াল থেকে দর্শন মিলল সুগম্ভীর হজরতবাল দরগা। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চুল সংরক্ষিত আছে যা মুগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে সৈয়দ আবদুল্লাহ সুদূর মদিনা শহর থেকে নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। মাজার দর্শন শেষে আমরা ফিরে চললাম আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে। মাথার ওপরে তখন ঝুঁকে এসেছে সন্ধে। নাগিন লেকে কৃত্রিম ফোয়ারার আলো আর দূরে দু'একটি দোকানের বিজ্ঞাপনের আলোগুলোও জলের উপরিভাগে সৃষ্টি করছে লাল-নীল আভা, সেসব সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে অন্তরাগে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ফিরেই পুরো ৪ দিনের কাশ্মীরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্যে ভাড়া করলাম।

পরদিন সকালে যথারীতি ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই ঘুম ভাঙলো। ভোরবেলার শ্রীনগর দেখার প্রবল ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে একা একা বেরিয়ে এলাম হোটেল রুম থেকে। ডাল লেকের পাশে পাশে দৌড়তে লাগলাম। শ'য়ে শ'য়ে কাশ্মীরি - বয়সের ভেদাভেদ ছাড়াই সবাই হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে ডাল-লেকের পাশ ধরে। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর ঠাণ্ডা মোটামুটি সহনীয় হয়ে এলো। ডাল লেকের ঘাটগুলো নাম্বারিং করা। এই ভোরে সেইসব ঘাট স্বাহ্য -উদ্ধাররত কাশ্মীরিদের দখলে। উল্লেখযোগ্য যেটা দেখলাম তাহলো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিন্দুমাত্রও শিথিল নয় অপুষ্ট এই ভোরেও।

স্বচ্ছতোয়া ডাল লেকের অভ্যন্তরে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ, ছোট-ছোট রুপোলি মাছ খেলছে সেই গুল্মলতা ঘিরে ঘিরে। হঠাৎ দেখলাম তুলতুলে ছোট ছোট বালিহাঁসের কয়েকটি ছানা জলকেলিরত। কাছে গিয়ে ছবি তুলবার জন্যে যেই ক্যামেরা তাক করেছি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দীর্ঘ ডুব সাতাঁর শুরু হয়ে গেল, এইখানে ডুব দেয় তো দূরে ওখানে গিয়ে ওঠে। শেষে ব্যর্থ হয়ে হোটেল রুমে ফিরে সবাইকে জাগিয়ে দিলাম। ফ্রেশ হয়ে দলবেঁধে মোড়ের ছোট্ট নাস্তার দোকানটিতে ছোলাবাটোরা ও গরম গরম পুরি সহকারে ব্রেকফাস্ট সারলাম। ইতিমধ্যে আমাদের ড্রাইভার রিয়াজ ভাই গাড়ি নিয়ে হাজির। শুরু হলো গুলমার্গ যাত্রা।

কাশ্মীরে ভ্রমণার্থীদের জন্যে বড়ই উদ্রেকের বিষয় হচ্ছে পথে পথে টোল পরিশোধের ঝামেলা, যা গাড়ির আরোহীকেই বহন করতে হয়। কোথাও একশ, কোথাও পঞ্চাশ কোথাওবা বিশ রুপি না দিলে রাস্তার উপর পড়ে থাকা বাঁশের ব্যারিকেড উঠবে না। এরকম প্রায় তিনটি ব্যারিকেড পেরিয়ে আমাদের ইনোভা পৌঁছালো গুলমার্গ জিপ স্ট্যান্ডে। গাড়ি পার্কিয়েরও ১০০ রুপি। গাড়ি থেকে নামতেই একঝাঁক ঘোড়াওয়ালা ঘিরে ধরলো, গুলমার্গ ঘুরিয়ে দেখাবে আর যেহেতু গণ্ডোলা (রোপওয়ে-কার) বন্ধ তাই বরফের কাছে নিয়ে যাবে। আসার আগেই এই ঘোড়াওয়ালাদের প্রতারণার ঘটনা পড়েছিলাম তাই ওদের কথায় কান দিলাম না। দু'জন কাশ্মীরি পুলিশ এগিয়ে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম সত্যি সত্যি গণ্ডোলা বন্ধ কিনা। ওরাও জানালো রিপেয়ারিং এর জন্যে ফেজ ওয়ান ও ফেজ টু অভিমুখী গণ্ডোলাই বন্ধ। ভগ্নচিত্তে আমরা হাঁটতে লাগলাম, পিছনে পিছনে হাঁটছে ঘোড়াওয়ালারা। পরিস্থিতিটা অনেকটা এই রকম, আমরা ঘোড়া নেবনা আর ওরা আমাদের ঘোড়ায় চড়িয়েই ছাড়বে। আমরা চুপচাপ হাঁটছি আর ওরা পেছন থেকে নানারকম মন্তব্য করছে - 'কতটুকু পায়ে হেঁটে যেতে পারবে দেখা যাবে, কিছুই দেখতে পারবে না' ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পর একজন ঘোড়াওয়ালা একজন পুলিশকে নিয়ে এল আমাদেরকে বোঝাতে যে হেঁটে হেঁটে গুলমার্গ দেখা যায় না। পুলিশটিও আমাদের ইনিয়ে-বিনিয়ে বোঝাতে লাগলো গুলমার্গ-দর্শণে ঘোড়ার গুরুত্ব। অবশেষে আমি ও নোমান দরদাম করতে লাগলাম, শুরুতে একটি ঘোড়া ৮০০ রুপি বললে আমরা বললাম ১০০ রুপি। শেষে অনেক বাগ-বিতণ্ডার পর প্রতি ঘোড়া ২০০ রুপিতে রফা হলো শুধুমাত্র নারী ও শিশুদের জন্যে। আমি ও নোমান পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম ওদের পিছুপিছু। প্রথমে গেলাম চিলড্রেন পার্কে। গলফ-কোর্টের মতোই সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মাঠ, চারপাশে পাইন ট্রি-এর নন্দিত শোভা, মধ্যখানে কৃত্রিম পাথুরে লেক। মাঠের মাঝে মাঝে বসবার জন্যে কারুকার্য শোভিত মেটাল বেঞ্চ। বন্ধের দিন হওয়াতে মোটামুটি অনেক কাশ্মীরি পিকনিক পার্টি সেখানে ভিড় করেছে পরিবার-পরিজনসহ। বিস্কিট ও ঠান্ডা পানি সহযোগে আমাদের মিনি লাঞ্চ সারলাম,পার্কে বসে। কিছুক্ষণ পর দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্যে রওনা হলাম গণ্ডোলা স্টেশনের দিকে। চড়তে না পারি অন্তত: স্টেশন আর কারগুলো দেখে আসি। গুলমার্গে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্প ঘুরে রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান-বর্ডার সংলগ্ন পর্বতচূড়ায় অকস্মাৎ কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেলো। জলবতী মেঘ, করাৎ-করাৎ শব্দে বাজ পড়ছে থেকে থেকে। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কারণ এই ঠাণ্ডার মধ্যে যদি বৃষ্টিতে ভিজে যাই তাহলে আমাদের শিশুদের তো বটেই এমনকি আমরা বয়স্করাও নিউমোনিয়ার আক্রমণ ঠেকাতে পারবো না, যেহেতু আমাদের সাথে বাড়তি কোন পোশাক নাই। তাই ঘোড়াওয়ালাদের বললাম তাড়াতাড়ি কোন আড়ালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারা আমাদের আশ্বস্ত করলো এই বলে যে বৃষ্টি ঠিক ওই পর্বতমালার উপরই ঝরবে, খোলা এই উপত্যকায় পড়বার সম্ভাবনা খুব কম। ঘোড়াওয়ালাদের ভবিষ্যতবাণী সত্যি হলো জোরালো এক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ধোঁয়াশা পর্বতগুলোকে মিনিট পাঁচেক ভিজিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। শুকনো অবস্থাতেই আমরা গণ্ডোলা স্টেশনে পৌঁছলাম।

স্টেশনে পৌঁছতেই দেখলাম বিশাল লম্বা লাইন। ওরেবাবা! সবাই কি আমাদের মতো দুধের-স্বাদ ঘোলে মেটাতে এসেছে নাকি! স্টেশনের সিকিউরিটি গার্ডদের জিজ্ঞেস করতেই আসল সত্য বেরিয়ে এলো। ফার্স্ট-ফেজে গণ্ডোলা ঠিকই চলছে, শুধুমাত্র মেন্টেনেন্স-এর জন্যে সেকেন্ড-ফেজই বন্ধ। প্রথমেই ধরলাম ঘোড়াওয়ালাদের আমাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করার জন্যে। আমাদের অভিযোগ তাদের কানে গেল কীনা ঠিক বোঝা গেল না , কারণ তখন তারা উদাস ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। কী আর করা, নোমানকে পাঠালাম তাড়াতাড়ি টিকিট কিনতে। মাথাপিছু ৪০০ রুপি করে টিকিট। প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক লাইনে দাঁড়ানোর পর আমাদের পালা এলো গণ্ডোলা চড়ে ফার্স্ট-ফেজ তথা খিলানমার্গের পর্বত চূড়ায় পৌঁছানোর জন্যে। একেবারে খাড়া পর্বতের ঢালে পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোপওয়ের টাওয়ার। ধীরে ধীরে রোপওয়ে উঠছে আমাদেরকে নিয়ে আর আমরা জীবনে প্রথমবার গণ্ডোলা চড়ায় রীতিমত উত্তেজিত। মোটামুটি বিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেলাম খিলানমার্গে। গণ্ডোলা স্টেশন থেকে বেরোতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। এই ভরদুপুরে এখানকার তাপমাত্রা এখন মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতে না জানি কী অবস্থা দাঁড়ায় !

খিদেয় সবার পেটে ছুঁচো ডন মারছে। তাই যেমন হোক,কারো জন্যে নুডুলস, কারো জন্যে ফ্রায়েড রাইসের অর্ডার দিলাম অস্থায়ী একটি হোটেলে। খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে খিলান মার্গের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পরিচিত হলাম কিছু কাশ্মীরি যুবকের সাথে। কাশ্মীরের আবহাওয়া

সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পেলাম তাদের কাছ থেকে। চিরশীতের রাজ্যখ্যাত খোদ কাশ্মীরেই নাকি এমন জায়গা আছে যেখানের গড় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস !! কত অজানারে . . .

খিলানমার্গ থেকে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ নেমে আসা পাহাড়ি সন্ধ্যা আমাদের পেয়ে বসলো। অন্ধকারের সঙ্গে ঠাণ্ডাও নামছে সমান তালে। রিয়াজ ভাইকে বললাম তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আসতে। আপেলের ভরা মরসুম এখন। গুলমার্গ থেকে ফেরার পথে পার্শ্ববর্তী আপেলবাগান থেকে প্রায় পঁচিশ-কেজি ওজনের একপেটি আপেল কিনলাম মাত্র ২০০ রুপি দিয়ে। রাত প্রায় আটটার দিকে শ্রীনগর শহরে পৌঁছে প্রথমেই রেস্টুরেন্ট করিমস-এ কাশ্মীরি বিরিয়ানি নামে অখাদ্য খেলাম। কেউ যেন ভুলেও এই রেস্টুরেন্টে না ঢোকেন। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। তাই হাল্কা পায়ে হেঁটেই হোটেলে ফিরলাম।

কাশ্মীর মানেই তো বরফরাজ্য, এত বছর শুধুমাত্র তুষার-আবৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন ছবি দেখে দেখে এমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল আমাদের সবার। কিন্তু বরফ কই, তুষারপাত কই, আমাদের তো মাথা খারাপ অবস্থা। আজ তাই আমরা সোনমার্গ যাবো। যতটুকু জেনে নিয়েছি তাতে এই ভর-গ্রীষ্মে শুধুমাত্র সোনমার্গের গ্লেসিয়ারগুলোই বরফে আবৃত থাকে। আমাদের ড্রাইভার রিয়াজভাই ঠিক সময়মতোই তুলে নিলো আমাদের হোটেল থেকে। ডাল লেক, নাগিন লেক হয়ে গাড়ি ঘুরে সোজা ঢুকে গেলো বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত সমৃদ্ধ কাশ্মীরের গাঁ এলাকায়। সোনালী পট-ভূমিকায় ধূসর পাথরের গা ও সবুজ এসবেস্টসে ছাওয়া ঘর, পাইনে ঘেরা গ্রাম গুলোকে দেখতে অনেকটা অয়েল পেইন্টিং এর মতো।

শ্রীনগর থেকে সোনমার্গের দূরত্ব মোটামুটি ৮০ কি: মি: , কিন্তু বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি রাস্তা হওয়াতে এই দূরত্ব পেরোতেই প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। গাড়ি সোনমার্গ পার্কিং পয়েন্টে পৌঁছতেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। অর্থাৎ যথারীতি ঘোড়াওয়ালাদের অত্যাচার, সাথে যুক্ত হলো আরেক সমস্যা। সোনমার্গ লোকাল ভিউ দেখতে হলে সোনমার্গের বাইরে থেকে আসা কোন গাড়িকে যেতে দেওয়া হয় না। লক্কর-ঝক্কর মার্কা টাটাসুমোই হায়ার করতে হবে তার জন্যে। গ্লেসিয়ারের দূরত্ব কতটুকু জানতাম না তাই এবারও ভুগতে হল। আসা যাওয়া মাত্র ৬ কি. মি. পথের জন্যে দু'হাজার রুপি গুণতে হলো। অচিন দেশ, কী আর করা!

সোনমার্গ ভ্যালিতে পৌঁছলে আবারও ঘোড়াওয়ালা! এ যেন ঘোড়াওয়ালাদেরই রাজ্য। মেজাজটা এমনিতেও খিঁচড়ে ছিল, তাই দু'একজনকে হালকা ধমক লাগাতেই পথ ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু পেছন থেকে ঠিকই টিটকারি দিতে থাকলো এই বলে যে - হেঁটে গেলে জীবনেও বরফের দেখা পাব না। কিছুক্ষণ পরের তাদের ভবিষ্যত বাণীকে বিফল প্রমাণিত করে দেখা মিললো প্রত্যাশিত তুষার-ছাওয়া পর্বত চূড়ার, তবে অনেক উঁচুতে এবং সীমিত আকারের। গলিত বরফের হিমশীতল জল নেমে এসে সোনমার্গ ভ্যালিতে সৃষ্টি করেছে পাথুরে ছড়ার, কুলকুল শব্দে বইছে সে বিশুদ্ধ জলের ধারা। সবাই জুতো খুলে নেমে গেলাম তাতে, তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। কেননা জল এতোটাই ঠাণ্ডা যে দশ-পনের সেকেন্ডের বেশি থাকা যাচ্ছে না। খাওয়ার পানির বোতল ভরে নিলাম, সঙ্গে থাকা বিস্কুট ও জেলি সহযোগে সবাই হাল্কা নাস্তা খেলাম, স্বস্তিও পেলাম, কারণ এখানেও অক্সিজেনের ঘাটতি আছে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষেই ঝরনা জলবাহী পাথুরে নদী সিন্ধু, তার পাশেই নয়নাভিরাম সোনমার্গ রিসর্ট। এখানের ঘাসের লনও গলফ-কোর্টের মতো সবুজাভ, আশেপাশে নানারঙের দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের বাগান - এককথায় অনন্য। রিসর্ট সংলগ্ন রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারলাম কাশ্মীরি মসলা সমৃদ্ধ ঝাল মুরগী ও ফ্রাইড রাইস সহকারে। খেয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর সোনমার্গ-ভ্যালির লনের বিছানো বেঞ্চে বসে রোদ-পোহাচ্ছি আর ছবি তুলছি ইচ্ছে মতো।

রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। আমরা চলেছি, আর আমাদের পাশাপাশি চলেছে বরফগলা উত্তাল সিন্ধু-নদী। মাঝপথে দেখা মিললো নদীর ওপারে ম্যাপল-গাছে ছাওয়া আরেকটি উদ্যানের, এটি একটি চিলড্রেন পার্ক। মাথাপিছু দশটাকা দর্শনী দিয়ে ঢুকলাম সবাই। মাথা ব্যথা করছিল সবার, চা খাওয়া তাই জরুরি। অনেকটা চড়া দাম দিয়েই পাইন-ম্যাপলে ঘেরা গাঢ় এই সবুজে বসে চা খেলাম সবাই,আমাদের শিশুরা পার্কে আগত অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক কাটানোর পর রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। শহরে যখন ঢুকলাম তখন আকাশ প্রদীপ পুরোপুরি নিভে গেছে।

যুসমার্গে আমাদের অভিযানটা তেমন সুখের হলো না। যতটুকু বুঝতে পারলাম, একমাত্র তুষারপাতের সময়টাতেই এই অঞ্চল আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। চিরাচরিত কাশ্মীরের গাঢ় সবুজ রূপ, বিস্তীর্ণ ঘাসের লন ও পাইনের সমারোহ। একেতো অফ সিজন, তার উপর সহিংসতার কারণে যুসমার্গ এখন বস্তুতঃ পর্যটক শূন্য। যার ফলে এখানকার ঘোড়াওয়ালাদের অবস্থাও ত্রাহি ত্রাহি। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান দুধ-গঙ্গা দেখার জন্যে হেঁটেই রওনা দিলাম ঘোড়ায় চড়ার হাজারো প্রস্তাব উপেক্ষা করে। একটু তফাতে সবার পেছনে আমি। এক বুড়ো ঘোড়াওয়ালা হাজির হলো তার ঘোড়া নিয়ে, অনুনয় করতে লাগলো তার ঘোড়াটি নেওয়ার জন্যে, গত কয়েকদিন উনি কোন পর্যটকও পাননি। ভাড়া হিসেবে আমার যা খুশি তাই দিলেই চলবে। আশপাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম উনিই সবচেয়ে বৃদ্ধ সহিস। মনটা নরম হয়ে গেল, উঠে পড়লাম উনার ঘোড়াতে। এদিকে আমার দেখাদেখি আমার স্ত্রীকেও উঠিয়ে নিলো বুড়োর নাতি তার ঘোড়াতে। যেহেতু আমাদের যা খুশি তাই ভাড়া দিতে হবে তাই কিছুদূর গিয়ে নোমানদেরও তুলে দিলাম অন্য চারটি ঘোড়াতে। সাতটি ঘোড়া টগবগিয়ে চললো কথিত দুধ গঙ্গার উদ্দেশ্যে. . .।

মাইলটাক যাওয়ার পরই শুরু হলো আসল বিপদ। ওরে সর্বনাশ !!! পাহাড়ের খাড়া গিরিখাত ধরে নামতে শুরু করলো আমাদের ঘোড়াগুলো, আলগা পাথুরে পথ খানাখন্দে পরিপূর্ণ। ঘোড়াওয়ালাদের হাজারো আশ্বাস সত্ত্বেও আতঙ্কে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কিছুদূর নেমে ঘোড়াগুলোও অস্বস্তিতে নাক দিয়ে ঘোঁ-ঘোঁ আওয়াজ করতে লাগলো আর সবেগে মাথা ও কান নাড়তে লাগলো। ঘোড়াওয়ালাদের জানালাম আমরা আর যাব না। মাথায় থাক আমাদের দুধ-গঙ্গা দর্শন। কিন্তু ঘোড়াওয়ালারা জানালো কোন সমস্যা নাই তাদের ঘোড়াগুলো অতি-প্রশিক্ষিত ও এ-পথে প্রতিদিন কয়েকবার যাতায়াত করে। ঘোড়াওয়ালাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা মৃদু কিঞ্চিৎ শব্দ শুনে ঘোড়াগুলো আবারও চলতে শুরু করলো আর আমরা সর্বশক্তিতে ঘোড়ার পিঠ-আঁকড়ে পড়ে থাকলাম।

কিছুদূর গিয়েই দেখা মিললো দুধ-গঙ্গার। এবার বুঝতে পারলাম এর নাম রহস্যটি। চওড়া দৈর্ঘ্যের পাথুরে নদী দুধ-গঙ্গা। পানির রঙ সম্পূর্ণ সাদা। এখন বর্ষা নয়, তাই বিশাল পাথরের চাঁইগুলো ডিঙিয়ে সফেদ জলরাশি কুলকুল করে বয়ে চলেছে, দু'ধারে পাইনের ঘন জঙ্গল, মাথার উপর অফুরন্ত নীল। নৈসর্গিক এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি জানিনা। সম্বিৎ ফিরে পেলাম 'হ্যালো কাউবয়' সম্বোধন শুনে। ফিরে তাকিয়ে দেখি দু'জন ষাটোর্ধ্ব বৃটিশ (পরে জেনেছি) পর্যটক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম আমাকে রাখাল বালক ডাকার কারণটি। অনেক আগে শখের বশে আমি একটি কাউবয় হ্যাট কিনেছিলাম, চিরাচরিত জিনস্ এর ট্রাউজার ও শীতকালীন জ্যাকেটও তার সাথে ভালোই মানিয়ে গেছে। ত্বকের রঙ পুরোপুরি পশ্চিমাদের মতো না হলেও রোদে পোড়া রাখাল-বালক হিসেবে আমাকে বেশ চালিয়ে দেওয়া যাবে। পরিচিত হলাম বৃদ্ধ দুই পর্যটকের সাথে। জানলাম ওঁরা হেঁটে হেঁটেই কাশ্মীর পর্যটন করছেন। থাকছেন সঙ্গে করে নিয়ে আসা টেন্ট ও স্লিপিং ব্যাগে। রান্নাবান্নাও নিজেরাই করছেন। অনেকটা চমৎকৃতই হলাম তাদের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও ভ্রমণ

পদ্ধতি দেখে।

দুপুরে শ্রীনগরে ফিতে খাওয়াদাওয়া দেরে বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় নোমান আর আমি বেরোলাম শেষ বারের মতো ডাল লেকের শোভা দর্শনে। দূরে হাউসবোটের রকমারি আলোকসজ্জা রাতের ডাল-লেককে করে তুলেছে নয়নাভিরাম। রাতের ডিনার হিসেবে কাশ্মীরি ভেড়ার টিক্কা ও নান কিনে নিলাম। রুমে ফিরেই অজান্তেই মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল।

আমাদের অন্তিম গন্তব্যস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত স্নিগ্ধ এক টুকরো স্বর্গ পহেলগাঁও। সরাসরি হিমালয় থেকে নেমে আসা লিডার নদী ঘিরে রেখেছে ছোট্ট এই শহরটিকে । জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত নয়নাভিরাম এই শহরটি বছরে মাত্র ৬ মাস দর্শনার্থীদের জন্যে উন্মুক্ত থাকে। সাধারণত: অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মার্চের শেষ নাগাদ পর্যন্ত এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রিতে ওঠানামা করে। তখন এখানে মানুষ বসবাসের অবস্থা থাকে না। মাত্র কয়েক কিলোমিটারের এই হিল স্টেশনের সমস্ত দোকানপাট, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও তুষার পাতের জন্যে। জুলাই-আগষ্ট প্রান্তিকে মুলত: হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অমরনাথ যাত্রার জন্যেই এ শহর খুলে দেওয়া হয়। শহর থেকে ১৬ কি:মি: উত্তরে অবস্থিত চন্দনবাড়ি থেকে শুরু হয় অমরনাথে তীর্থযাত্রা।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে কোনপ্রকার বিরতি ছাড়াই আমরা ঢুকে গেলাম পহেলগাঁও এর বিস্তীর্ণ আপেল বাগানে। ইতিপূর্বে গুলমার্গ ও যুসমার্গেও আমরা আপেল বাগান দেখেছি। কিন্তু পহেলগাঁও এর মতো এতো সুবিশাল আয়তনের উদ্যান এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি। মাইলের পর মাইল বাগান এবং সৌভাগ্য বশতঃ এখনই আপেলের ভরা মরশুম। দুপুর হয়ে এসেছিল। মূল শহর তখনও ঘন্টা খানেকের পথ। তাই আমাদের ড্রাইভার রিয়াজ ভাইকে বললাম অনুরোধ করলাম বড় দেখে একটি আপেল বাগানেই ব্রেক নিতে।

এই বাগানটির মালিক ওসমান শেখ। উনি এক ছেলে, ছেলের বউ, এক মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে এই বাগানের পরিচর্যা করেন তিনি। কিছু বাড়তি আয়ের জন্যে বাগানের মূল ফটক সলগ্ন একটি মুদি দোকানও চালান তিনি। হোটেল থেকে সাথে করে নিয়ে আসা ফ্রাইড রাইজ ও চিলি চিকেন দিয়ে লাঞ্চ সারলাম সবাই। তারপর ঢুকে পড়লাম একমাথা উচু বাগানের মধ্যে। আপেলের ভারে নুয়ে পরেছে প্রায় প্রতিটি গাছ। এক একটি আপেলের ওজনই প্রায় ছ'শ থেকে সাতশ' গ্রাম। দেখলেই জিভে জল আসে, কিন্তু বিনা অনুমতিতে ছিঁড়লেই দু'হাজার রুপি তৎক্ষনাৎ জরিমানা। ফলে শুষ্ক মুখে শুধুই ছবি তোলা। সহৃদয় বাগানমালিক হয়তো আমাদের মনোভাব বুঝতে পারলেন, সবাইকে বিশাল আকৃতির এক-একটি আপেল উপহার দিলেন খাওয়ার জন্যে। উপহারের বিনিময় মূল্য হয় না তবুও অর্থ-বৃত্তের দিকে পিছিয়ে পড়া এই কাশ্মীরিদের জন্যে ইতিমধ্যে আমাদের সবার মনে মমত্ববোধ জেগেছে । আপত্তি সত্ত্বেও তাই ওনার নাতি-নাতনিদের সবার হাতে কিছু কিছু রুপি গুজে দিলাম। খানিকক্ষণ গল্প গুজব করলাম তাঁদের সঙ্গে। রিয়াজ ভাইকে আমাদের পহেলগাঁও পৌঁছে দিয়ে আবার দিনে দিনে শ্রীনগর ফিরতে হবে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাততাড়ি গোটালাম লোভনীয় ও মোহনীয় এরকম একটি বাগান থেকে।

পহেলগাঁও শহরে যখন ঢুকলাম তখন বেলা প্রায় দু'টো। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। অথচ এরই মধ্যে হাড়কাপাঁনো শীতের উপস্থিতি। চটজলদি হোটেল ঠিক করে ফেললাম। আমাদের রুম দু'টিই রাস্তার দিকে, ফলে সামনে দণ্ডায়মান বিশাল পর্বতমালার তুষার আবৃত সুউচ্চ রিজ ও তার সমতলে অনিন্দ্য-সুন্দর পহেলগাঁও টাউন-গার্ডেন। দু'ধারে প্রবাহমান লিডার নদী, তার মাঝে ছোট ছিমছাম এই উদ্যানে পেতে রাখা রঙিন বেঞ্চ ও লাইট পোষ্ট, এবং যথারীতি নাম না জানা দুর্লভ অর্কিডের সমারোহ। হোটেলে লাগেজপত্তর রেখেই ফ্রেশ হতে হতে বেলা সাড়ে তিনটে। সবাই এক কাপ করে কফি খেয়ে নিয়ে প্রথমে গা-গরম করলাম তারপর ভারী জামা-কাপড় চাপিয়ে সোজা উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত। শুধুমাত্র স্থানীয় কিছু কাশ্মীরি ও একেবারে নগন্য সংখ্যক পশ্চিমী পর্যটকের দেখা মিললো। সন্ধ্যা অবধি পার্কে কাটিয়ে বাচ্চাদেরকে হোটেলে পাঠিয়ে আমরা বেরোলাম নতুন দেখা এই শহরের বিপনিবিতান দর্শনে। শহর বন্ধের সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, তাই ক্রেতাশূন্য দোকানগুলোতে সবকিছুই মোটামুটি জলের দরে বিকোচ্ছে। স্থানীয় পন্যের মধ্যে শীতের উন্নতমানের শাল ও সোয়েটারই হচ্ছে এখানে হস্ত-শিল্পের মূল নিদর্শন। আমাদের স্ত্রীরা কিছু কেনাকাটা করলো তারপর নোমান গিয়ে বাচ্চাদের হোটেল থেকে নিয়ে আসতেই মোটামুটি গোছের একটি রেস্টুরেন্টে বসে কাশ্মীরি নান সহকারে নিরামিষ খেলাম সবাই। সারাদিনের ধকলে গিয়েছে, তাই হোটেলে ফিরেই সবাই ঘুমে কাদা।

পরদিন সকালে নাস্তা না সেরেই জিপ স্ট্যান্ডে গেলাম আমি আর নোমান। প্রায় পর্যটক শূন্য এই অঞ্চলেও গাড়ি ভাড়ার সঙ্গে দিতে হবে সমিতির চাঁদা। একটু ঘোরাঘুরি করতেই স্ট্যান্ড-এর বাইরে থেকে প্রায় অর্ধেক ভাড়ার চুক্তিতে একটি টাটাসুমো ঠিক করে ফেললাম পহেলগাঁও সাইট সিয়িং এর জন্যে। ঘন্টাখানেক সময় চেয়ে নিলাম ড্রাইভারের থেকে ব্রেকফাস্ট সারার জন্যে, তারপর গাড়িতে চড়লাম সবাই পহেলগাঁও দর্শনে।

প্রথমেই গেলাম সম্প্রতি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া চন্দনবাড়িতে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির করাল আঘাতে দুমড়েমুচড়ে গেছে সবই। স্বর্গে এসে ধ্বংসযজ্ঞ দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই এখানে আর বেশিক্ষণ না কাটিয়ে রওনা দিলাম আরুভ্যালির উদ্দেশ্যে। চারদিকে হিমালয়ের পাইন-ফারের সবুজের সমারোহ, টুলিয়ান লেক, শীষনাগ লেক নামক অমৃতজল পাথুরে নদীদের পেছনে ফেলে আমরা এসে পৌঁছলাম আরু ভ্যালিতে। এখানকার দৃশ্যাবলী অনেকটা সোনমার্গের মতোই। তিনদিকে তুষার আবৃত পর্বতমালা ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকা, সেইসব গ্লেসিয়ার থেকে নেমে আসা বরফগলা জলের অগভীর স্বচ্ছ ঝিল, আর মাথার ওপরে অফুরন্ত নীল। সময়ের স্বল্পতার কারণে আধঘন্টার বেশি থাকা গেলনা এখানেও। গাড়ি ঘুরলো ভারতীয় চলচ্চিত্র 'বেতাব' খ্যাত বেতাব-ভ্যালির দিকে। আলোচিত এই সিনেমাটির এখানেই দৃশ্যায়িত হয়েছিল। বেতাব ভ্যালিতে লিডার নদী অনেকটা চওড়া। নান্দনিক শৈলীতে নির্মিত সেতুতে নদী পেরিয়ে ভ্যালিতে ঢুকলাম। মোটামুটি সাতটি ফুটবল মাঠের সমান আকৃতির বেতাব ভ্যালির সৌন্দর্য্য সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকর। আমাদের বাচ্চারা আনন্দে নেমে পড়লো নদীর কাকচক্ষু স্বচ্ছজলে। কিন্তু মুহুর্ত কয়েকই, বরফগলা জলের ভয়াবহ ঠাণ্ডার কামড়ে পড়িমড়ি উঠে এলো পাড়ে। এই মরসুমে বেতাব ভ্যালিও কার্যত স্থানীয় পিকনিক পার্টির দখলে। আস্ত ভেড়ার রোস্ট সহকারে মসলাদার খাবারের মনমাতানো সৌরভ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আশেপাশে, আর আমাদের ক্ষুদার্ত বেহায়া নাক তা তৎক্ষনাত ধরে ফেলছে! বেতাব ভ্যালিতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক কাটালাম। সাথে আনা আপেল, বিস্কিট ও পানি সহকারে মিনি লাঞ্চ সেরে আবার ফেরার পথে রওনা। বিকেলে আবার আবার পদব্রজে পহেলগাঁও শহর পরিদর্শন।

পরদিন ভোর পাচটাতে পহেলগাঁও থেকে গাড়িতে বেরিয়ে এলাম। এই শহরতলি তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিমজ্জিত, নিকষকালো আকাশে শুকতারার সহ অন্য নক্ষত্রের সুস্পষ্ট হইচই। যাযাবরদের ভেড়ার পাল ও আপেলের ভরা মরসুম হওয়াতে ফলবাহী লরির চাপে প্রায় চৌদ্দঘন্টা জার্নি শেষে যখন আমরা জম্মুতে পৌঁছলাম দিল্লিগামী ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র আর বিশ মিনিট বাকি।

~ কাশ্মীরের তথ্য~ কাশ্মীরের আরো ছবি ~

মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মরত তুহিন ডি. খোকনের বেড়ানোর নেশা ছোটবেলা থেকেই। বড় হয়ে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ফটোগ্রাফিও। বই পড়া ও গান শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও করছেন বেশ কয়েকবছর ধরেই।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

জারোয়াদের দেশে কয়েকদিন

স্তুতি বিশ্বাস

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরো ছবি ~

আন্দামান - কালাপানির দেশ, জারোয়াদের দেশ...
ইতিহাস আর ছেলেবেলা থেকে শোনা নানান গল্পকথা মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক রোমাঞ্চকর আবহ...
শত শত স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী, আইনের চোখে অপরাধী মানুষের অন্তিম গন্তব্যস্থল। অতীতের অত্যাচার আর উৎপীড়নের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় বিরাজ করবে এই নাম। নিপীড়িত মানুষের হাহাকার যেন আজও গুমরে গুমরে বেড়ায় আন্দামানের আকাশে বাতাসে। গহন অরণ্যে স্তব্ধ নিশ্ছিদ্র ঝোপঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে প্রাচীন গম্ভীর বনস্পতিরা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। অরণ্য যেন এক ধ্যানমগ্ন বিশাল যোগী। আর কালাপানি - সে তার ঢেউয়ের অর্ঘ্য সাজিয়ে সেই যোগীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে চাইছে আমার কালিমা ঘুচিয়ে দাও। নয়ন মেলে দেখ আমার রঙ, আমার রূপ - কখনো শান্ত স্নিগ্ধ, কখনো বা উত্তাল।

অনন্ত সমুদ্র, সোনালি বেলাভূমি আর জারোয়া দর্শনের টানে আমরাও গত শীতে আন্দামানে পৌঁছেছিলাম। চেন্নাই থেকে ভোরবেলা আন্দামানের ফ্লাইট। তাই আগের দিন রাতেই চেন্নাই এয়ারপোর্টে ডেরা গেড়েছিলাম। কাকভোরে সূর্য আর প্লেন দুটোই একসঙ্গে আকাশে উঠল। ঘন্টাদুয়েক বাদে পোর্টব্লেয়ারে নামলাম। সাদামাটা ছোট্ট এয়ারপোর্টে। মালপত্র নিয়ে বাইরে আসতেই মখমলের মত মিষ্টি রোদ দুহাত বাড়িয়ে বলল, সু-স্বাগতম। সবুজ, সবুজ আর সবুজ - চারিদিক শুধুই সবুজ। তারই মাঝে নারকেল, সুপারির সারি। ধোঁয়া-ধুলো বিহীন পরিবেশ। বেশ কিছু লোক নাম লেখা কাগজ উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের হাতে আমাদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড দেখে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটি একগাল হেসে বললো - ওয়েলকাম টু আন্দামান। বুঝলাম এই আমাদের আগামী দিনগুলির কান্ডারী। নাম সনু। চড়ে বসলাম তার গাড়িতে - গন্তব্য হোটেল। রাস্তা চড়াই উতরাই। ফাঁকে রাস্তায় গাড়ি চলল নিজের মত - পিছন থেকে হর্ন দেওয়া বা ওভার টেক করার বিশেষ কেউ নেই। যেতে যেতে রাস্তার ধারে নজরে পড়ল টিনের ছোট ছোট দোচালা বাড়ি। সামনে সুন্দর পরিপাটি বাগান। লোকজন বেশ ধীরেসুস্থে চলেছে রাস্তা দিয়ে। বুঝলাম কারোর সেরকম তাড়া নেই। ড্রাইভার ছেলেটি বেশ মিশুকে। পূর্বপুরুষ কেরালাবাসী হলেও ওর জন্মকর্ম সব এই দ্বীপেই। গল্প করতে করতে বললো ছোট জায়গা, লোকজনও কম। কারোর সঙ্গে সকালে দেখা হলে আবার বিকেলেও দেখা হয়ে যায়। সবাই সবাইকে চেনে। তবে কর্মসংস্থান খুব কম। আগে লোকে ক্ষেতিবাড়ি করেই জীবনযাপন করত। এখন ট্যুরিজম হওয়ায় বেশ কিছু লোক কাজ পেয়েছে। গল্পে গল্পে কখন হোটেলের গেটে পৌঁছে গেছি খেয়াল করিনি। নামটি বেশ সুন্দর - 'মেগাপড নেস্ট'। মেগাপড আন্দামান দ্বীপমালার প্রতীকি পাখি। অনেকটা মুরগীর মত দেখতে। কয়েক ফুট লম্বা। লম্বা লম্বা পা। ধারালো নখ। গায়ের রং বাদামী বা কালো, তাতে সাদা ছিট ছিট। মাথাটা লাল। এরা বিখ্যাত স্বভাবের জন্য। সমুদ্রের ধারে বালি,পচা জৈবপদার্থ, ছত্রাক এসব দিয়ে উঁচু বাসা তৈরি করে একটা বাসা বহু বছর ব্যবহার করে। মা পাখি বাসায় ডিম পেড়ে চাপাচুপি দিয়ে চলে যায়। গরম বালি আর জৈবপদার্থের পচনক্রিয়ার স্বাভাবিক উত্তাপে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। দেখতে দেখতে পূর্ণাঙ্গতা পায়। তারপর একদিন শিশু মেগাপড বাসা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন সে জানে না কে তার বাবা-মা। অনেকটা আন্দামানের লোকজনের মত যাদের কোন অতীত নেই। কার হাত ধরে এসেছে বলতে পারবে না। নিজে কী করতে পেরেছে সেটাই শুধু জানে।

রিসেপসনের জাবদা খাতায় সইসাবুদ মিটিয়ে আমরা এগোলাম কটেজের দিকে। সমুদ্রের দিকে সুন্দর সাজানো বাগান পেরিয়ে বেশ খানিকটা নীচে কটেজ। কটেজের বারান্দায় দাঁড়াতেই সমুদ্রের লবনাক্ত শীতল হাওয়া গায়ে লাগলো। সামনে শুধু জল জল আর জল। ডানদিকে নির্জন রস আইল্যান্ড। বাঁদিকে লাইট হাউস। মাঝে মাঝে ঢেউ এসে টিলার নীচে আছড়ে পড়ছে। দুপুরে সামান্য লাঞ্চ করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম সেলুলার জেল দেখতে। জেলের সাতটা উইংর মধ্যে তিনটে দর্শনার্থীদের জন্য খোলা। বাকীগুলো ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। ছোট ছোট কুঠরীতে মানুষ কী ভাবে দিন কাটাত ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। তার ওপর ছিল অমানুষিক অত্যাচার, সাহেবদের চাবুক। মানুষ এত নৃশংস হতে পারে!! সন্ধ্যেবেলা লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো দেখে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন গন্তব্য বারাটাং আইল্যাণ্ড, পথে জারোয়া দর্শন।

আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড পোর্টব্লেয়ার থেকে জারোয়া অধ্যুষিত জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে বারাটাং। প্রতিদিন সীমিত সংখ্যক গাড়ি চলে এই পথে। সরকারি পারমিট ছাড়া যাওয়া যায় না। সনু বললো, সকাল ৬ টার মধ্যে জঙ্গলের গেটে পৌঁছাতে হবে, লম্বা লাইন পরে। জারোয়ার কথা প্রথম শুনি 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমায়। সে তো পর্দায়। আর এ হল চাক্ষুশ দেখা। বেশ উত্তেজনা সকলের মনেই। ভোর সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে। শেষরাতে চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমার কল্পনায় জারোয়াদের ডেরার নিভে যাওয়া আগুনের গোলাপী ধোঁয়া দিগন্তে মিলিয়ে যাবার আগেই গেটে পৌঁছে গেলাম। সনু গেল পারমিটের সন্ধানে। দেখি এক পুলিশকর্তা মাইকে কিছু একটা ঘোষণা করছেন। অনেকগুলো গাড়ির একটা কনভয় পুলিশ পাহারায় যাবে। জঙ্গলে গাড়ি থামানো, জারোয়াদের ফটো তোলা বা খাবার দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। খানিক পরে সনু পারমিট নিয়ে ফিরে এলে আমাদের যাত্রা শুরু হল জঙ্গলের পথে। হাজার হাজার বছর ধরে বেড়ে ওঠা গর্জন, বাদাম ও সিমোয়া গাছের জঙ্গল। যেমন তার গঠন তেমনি তার উচ্চতা আর শক্তি। আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাছেদের কথোপকথন শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ড্রাইভার বলে উঠল - 'জারোয়া' 'জারোয়া'। তাকিয়ে দেখি বেশ কিছু কুলীকামিন ছোট ট্রাকে করে চলেছে কোথাও রাস্তা বানাতে। তাদের সঙ্গে দুজন জারোয়াও চড়ে গেছে ট্রাকের ওপরে। একটু এগোতেই রাস্তার বাঁকে দেখি এক বিবস্ত্র জারোয়া রমনী পিঠে বাচ্চা বেঁধে চলেছে। সনু জানলার কাঁচ বন্ধ করে দিতে বললো। জারোয়ারা নাকি জানালা খোলা পেলেই হাত বাড়িয়ে জিনিষপত্র তুলে নেয়। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে নাইটি পরা একটি জারোয়া মেয়ে সঙ্গে প্যান্ট পরা একটি ছেলে আমাদের গাড়ি দেখে হাত নাড়তে লাগলো। সনু গাড়ি আস্তে করতেই ওরা জানলার কাছে এসে কী বললো। সনু বললো, বিস্কুট চাইছে। দুটো বিস্কুট এগিয়ে দিতেই ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে পুরো প্যাকেটটা নিয়েই চলে গেল। ঘন অরণ্যের পথে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। হঠাৎ দেখি এক বিরাট ছায়া আমাদের সঙ্গে চলেছে। পিছন ফিরতেই দেখি এক জারোয়া যুবক আমাদের গাড়ির পেছনে উঠে পড়েছে। ঠিক কলকাতার ভিড় বাসে কণ্ডাক্টার জায়গা না পেলে যেভাবে পেছনের পাদানীতে দাঁড়ায় সেই ভাবে। সনু গাড়ি থামিয়ে কিছু বলায় ছেলেটি ভীষণ ভাবে দুদিকে মাথা নাড়ল। বুঝলাম ও নামতে নারাজ। অবশেষে সনু বললো পুলিশ আ রহা। ব্যাস এতে কাজ হল। ছেলেটি নেমে দুড়দাড় করে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পুলিশকে নাকি খুব ভয় পায়। কৌতুহলী হয়ে সনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জারোয়া ভাষা জান?' ও স্মার্টলি উত্তর দিল, 'ওরা তো হিন্দি বলে, হিন্দি বোঝে'। হতাশ হলাম জারোয়ারাও নিজের ভাষা ছেড়ে হিন্দি বলছে!!

ঘন্টাদুয়েক চলার পর বারাটাং জেটি। সেখান থেকে বড় নৌকায় বিরাট জলরাশি পেরিয়ে বারাটাং দ্বীপ। নৌকাতে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হল। এবার স্পীডবোট। খাড়ির মধ্য দিয়ে যাব লাইমস্টোন কেভ। সরু খাড়ি একবারে একটা বোটই যেতে পারে। দুদিকের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। দ্বীপের রক্ষিবাহিনী। শিকড়ের জাল দিয়ে ভূমিক্ষয় আটকে রেখেছে। তলা দিয়ে জল চলে গেছে। জলের ওপর ঝুকে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। মাথা বেশি উঁচু করলেই ধাক্কা লাগবে। নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে দুএকটা পাখির আওয়াজ প্রাণের স্পন্দন জানান দিচ্ছে। আধঘন্টা চলার পর গাছ কেটে বানানো ছোট্ট জেটিতে পৌঁছালাম। মাটির কয়েকটা ধাপ নেমে পায়ে চলা জঙ্গলের রাস্তা। চলেছি অজানা পথে চুনাপাথরের গুহার সন্ধানে। সঙ্গে গাইড। এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলে কে আবিস্কার করেছিল এই গুহা, কে জানে! গাইড বললো, মাইল খানেক হাঁটতে হবে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। হঠাৎ দেখি জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে। সামনে ক্ষেত, গরু চড়ছে। প্লাস্টিকের সিট লাগিয়ে অস্থায়ী দোকানে ঠাণ্ডা শরবৎ, শশা বিক্রি হচ্ছে। এই গহন অরণ্যেও মানুষ বসতি করেছে। ক্লান্ত হয়ে ওখানেই বসে পড়লাম। নিমুপানি খেতে খেতে শুনলাম গুহার কাছে ১০/১২টি পরিবারের একটি গ্রাম আছে। তারা কোন একসময়ে ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী ছিল। চাকরি করতে এসে এখানেই থেকে যায়। বর্হিবিশ্বের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ খুবই কম। খুব দরকার পড়লে পোর্টব্লেয়ার যায়। সত্যি মানুষগুলো কত অল্পে খুশি। ওদিকে গাইড টর্চ নিয়ে প্রস্তুত গুহার ভেতরে যাবার জন্য। গুহার মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাইডের লাইটই একমাত্র ভরসা। পাথরের ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে লাইমস্টোনে তৈরি হয়েছে নানান কারুকার্য। কল্পনায় কোথাও ঝাড়লণ্ঠন, কোথাও পাখি, কোথাও গনেশের অবয়ব। এইসব কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা প্রকৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে সুনিপুণ হাতে গড়ে তুলেছে তার শিল্পকলা। গুহা দেখা শেষ করে খাড়ি পেরিয়ে আবার ফিরলাম জেটিতে। জেটির কাছে ছোট্ট একটি জনপদ। কয়েকটি খাবার দোকান। সেখানেই লাঞ্চ সেরে চললাম মাড ভলকানো দেখতে। এ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। দেখে কাদার ঢিবি ছাড়া বেশি কিছু লাগলো না। এবার ফেরার পালা। অসীম জলরাশি পেরিয়ে গহন অরণ্যের পথ। ফেরার পথে বেশ কিছু সাদা ঘাসের পোষাক পরা জারোয়া নজরে এল। পায়ে চলা পথে ঘরে ফিরছে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি মিষ্টি রোদে ঘর ভরে গেছে। আজ বিশ্রাম। দুপুরে মিউজিয়াম দেখে শহরের মধ্যেই ঘোরা হল। বিকেলে ভাইপার আইল্যাণ্ড দেখে ফেরার পথেই সূর্য পশ্চিমে হেলে গেল। একটু পরে রক্তাভ লাল সূর্য দিগন্তের অসীম জলরাশিতে ডুব দিল। রাতেই মালপত্র সব গুছিয়ে নিলাম। পরের দিন সাতসকালে যাব হ্যাভলক আইল্যাণ্ড।

ফিনিক্স বে জেটি থেকে সকাল ৬ টায় জাহাজ ছাড়ল। ঝকঝকে আকাশ, ঝলমলে রোদ। নীল জলরাশি কেটে এগিয়ে চলেছে জলপরী। গন্তব্য সবুজ দারুচিনি দ্বীপ হ্যাভলক। আমরা ডেকে গিয়ে বসলাম। দেখতে দেখতে ডাঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিকে রাশি রাশি জল। অজস্র জলকণা ভেসে ভেসে মাঝে মাঝে রামধনু তৈরি করছে। একটু পরেই রোদের রিমঝিম তাপে আর বসে থাকা গেল না। জাহাজের পেটের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এরপর চললো রোলিং - এধার থেকে গড়িয়ে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক। বেগতিক দেখে কেউ কেউ মেঝেতে শুয়ে পড়ল। তিন ঘন্টা ধরে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে হ্যাভলক দ্বীপে পা দিলাম। জেটিতে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সে নিয়ে গেল বিজয়নগর বিচের ডলফিন রিসর্টে। এখানে আমরা থাকব নিকোবরি কটেজে। মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে গোল টিনের ছাদ দেওয়া ছোট ছোট কটেজ। সামনে অনন্ত জলরাশি। সমুদ্র এখানে বহুরূপী - সকালে সাদা, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হালকা সবুজ ওড়না জড়িয়ে নেয়, পড়ন্ত বিকেলে নীলবর্ণা। রুমে মালপত্র রেখে বেড়িয়ে পড়লাম সমুদ্রের আহবানে। উত্তাল সমুদ্র, রূপালি বেলাভূমি, মৌন পাহাড়, গম্ভীর জঙ্গলের সমন্বয় রাধানগর বিচ। দুধের মত সাদা ঢেউ ফেনিল হয়ে উপচে পড়ছে আবার পরক্ষণেই গুটিয়ে নিচ্ছে আঁচল। দুধারে নারকেল গাছের সারি। বেলাভূমির সাদা বালি পায়ে মেখে এগিয়ে চললাম। চারিদিকে ছড়ানো ঝিনুক, শামুক, সামুদ্রিক কোরাল। প্রকৃতির এই অনাবিল রূপ দেখে যেন আশ মেটে না - দুহাতে উজাড় করে সাজিয়েছে এই দ্বীপমালা। ফেরার পথে দেখি তটভূমি হারিয়ে গেছে জলের টানে। বিচের ধারে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু দোকান। এক জায়গায় দেখি নিকোবরি ডাব বিক্রী হচ্ছে। এ ডাবের জল খুব মিষ্টি। তবে দামটাও বেশ সরেস।

পরের দিন সকালে পায়ে হেঁটে বেরোলাম দ্বীপ দেখতে। ছোট জায়গা। মাঝখানে বাজার। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজনের বাসস্থান। বেশিরভাগই বাঙালি - পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। ভিটামাটি ছেড়ে এসে এখানে জঙ্গল কেটে নতুন বসতি করেছে। লোকজন সাদাসিধা মিশুক প্রকৃতির। আলাপ হল সূত্রধর পরিবারের সঙ্গে। নিজের সুপারি বাগানে ছোট ছোট কটেজ বানিয়ে ব্যবসা করছেন। অতিথি আপ্যায়নের ভার গৃহিনীর ওপর। ওদের ছোট্ট রেস্তোঁরায় ভাত,ডাল ও কুকারী মাছের ঝোল দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম। ফাউ হিসেবে প্রচুর গল্প হল। ফেরার সময় আমাদের ব্যাগে বেশকিছু বাগানের কলা ভরে দিলেন।

ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, সভ্যতার পাগলা ঘোড়া এই দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সে ভাবে তছনছ করতে পারেনি এখনও। জানি না প্রকৃতি আর কত দিন এই শান্তির নীড়কে ধরে রাখতে পারবে!

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরো ছবি ~

বর্তমানে দিল্লীর উপনগরী নয়ডার বাসিন্দা স্তুতি বিশ্বাস স্বামী ও পুত্রের কর্মসূত্রে ঘুরেছেন দেশবিদেশ। বেড়ানো, বাগান করা, রান্না, গল্পের বই পড়তে নিজেও যেমন ভালোবাসেন তেমনি এই সব বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে খুবই আনন্দ পান।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

কো-লার্ন দ্বীপে মধুচন্দ্রিমা

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

থাইল্যাণ্ডের তথ্য

অথৈ সমুদ্রের জল ভেঙে ফেরিটা এগিয়ে চলেছে। রঙ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে জলের গভীরত্ব। দু-ধারে শুধু জল আর জল। হঠাৎ স্পিকারে ঘোষণা, যারা যারা প্যারাসেলিং বা স্নর্কেলিং বা স্কুবা ডাইভিং করেতে আগ্রহী তারা এই ফেরি পরিবর্তন করে অন্য ফেরিতে চলে যান। কো-লার্ন দ্বীপ থেকে ফেরার পথে আবার তাদের এই ফেরিতে তোলা হবে। দেখি বেশ কিছু তরুণ তরুণী (বেশিরভাগই চিন ও জাপান থেকে আসা) অসীম উৎসাহের সঙ্গে অন্য ফেরিতে যাবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগল। আমরা চলেছি পাটায়া থেকে কিছু দূরে অবস্থিত কো-লার্ন বা কোরাল দ্বীপে। জলপথে ফেরিতে করে যাওয়া, দ্বীপ ঘুরে দেখা, সমুদ্র স্নান করা, দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বিকেলে আবার পাটায়া ফেরা - এই হচ্ছে আমাদের সারা দিনের সূচী। এখানে প্যারাসেলিং-এর কায়দা গোয়ার থেকে কিছুটা আলাদা। বে অফ থাইল্যান্ড একটা জেটি - যেটা শুধুমাত্র প্যারাসেলিং এর জন্যই রাখা হয়েছে। স্নর্কেলিং ও স্কুবা ডাইভিং এর জন্যও বেশ উন্নতমানের আলাদা ব্যবস্থা আছে। আর যাঁরা শুধুই দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তাদের জন্য রয়েছে আলাদা প্যাকেজ। আমরা শেষের প্যাকেজটাই নিয়েছিলাম।

পাটায়া থেকে কো-লার্ন বা কোরাল আইল্যান্ড যেতে লাগে এক ঘন্টা। ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকাল ৯ টার সময়ে আমরা উঠে পড়েছিলাম নির্দিষ্ট বোটে। তখনই রোদের তাপ বেশ চড়া। বোটের সবাই মুখে ও হাতে - পায়ে প্রচুর পরিমাণ সান-স্ক্রীন মাখতে শুরু করলেন। দেখাদেখি আমরাও খানিকটা করে মেখে নিলাম। কিছুদূর এগোতেই জোয়ার এসে গেল। সমুদ্রে জোয়ারের টানে দুলতে থাকা ছোটো বোট থেকে আমাদের তুলে নেওয়া হল গভীর জলে অপেক্ষমাণ একটি ফেরিতে। নৌকোগুলো এমন দুলছিল যে ফেরিতে ওঠার সময় সঙ্গের বাচ্চাগুলোর জন্য একটু ভয়ভয়ই করছিল।

সমুদ্রের বুক চিরে যত গভীরে ফেরি এগোতে লাগলো ততই আমাদের অবাক হওয়ার পালা - জলের রঙ বারবার যেন বদলে বদলে যাচ্ছে। ঘন্টা খানেক চলার পর পৌঁছলাম কো-লার্ন দ্বীপে। ফেরিটি একেবারে সৈকতে না পৌঁছে কিছুটা দূরে দাঁড়াল। ফেরি থেকে নেমে, আবার ছোটো বোটে উঠলাম। তারপর খানিক জল ভেঙে পৌঁছে গেলাম দ্বীপে। এই দ্বীপের বালির রঙ প্রায় ঝকঝকে সাদা। আর জলও খুব স্বচ্ছ। শুনলাম এরকমই কোনো একটি ভার্জিন বিচে জেমস বন্ডের একটি ছবির শুটিং হয়েছিল কিছুদিন আগে।

কো-লার্ন দ্বীপটি আকারে খুব একটা বড় নয়। খুব কম মানুষজন থাকেন এখানে। পাহাড়ের মাথায় একটি চার্চ আছে। বিচে আছে কিছু রেস্টুরেন্ট, কয়েকটা স্যুভেনির শপ - যদিও সংখ্যায় খুবই কম। একটা সরু রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আমরা বিচটি হেঁটে দেখছিলাম। অন্য ফেরিতে আসা কয়েকজন পর্যটক সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লেন ফটো শ্যুটের জন্য। তাঁদের রকম সকম দেখে বুঝতে পারলাম ওই দলের একজন বিচ মডেল। কোনো আর্ন্তজাতিক ম্যাগাজিনে বিচ মডেলিং এর ফটো পাঠাবার জন্য তাঁরা এই দ্বীপে এসেছেন। দুই-তিন জন ক্যামেরাম্যান ফটো তুলতে লাগলেন। আর আমরাও এই সুযোগে লাইভ বিচ মডেলিং দেখে নিলাম।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ৫০ ভাট দিয়ে ঠাণ্ডা ডাবের জল খেয়ে রঙিন ছাতার তলায় আশ্রয় নিলাম। অনেকে বিচে ছাতার তলায় শুয়ে শুয়ে ফুট ম্যাসাজ নিচ্ছিলেন। কিছু পর্যটক সমুদ্রে স্নান করতে নেমে গেলেন। আমরাও কিছুক্ষণ জলে হাত পা ছুঁড়ে নিলাম, কেউ কেউ বানানা রাইড চড়লেন। সমুদ্র স্নান করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। ঝকঝকে পরিস্কার ওয়াশরুমে মিষ্টি জলে স্নান করে এসে দেখি এক অভিনব লাঞ্চ রেডি। প্রতিটি টেবিলে দুটো ফ্যামিলির বসার আয়োজন। আমরা একজন জাপানি কাপল- এর সঙ্গে টেবিল শেয়ার করলাম। লাঞ্চে প্লেন রাইস, সামুদ্রিক মাছ ভাজা, আলু ভাজা ও স্কুইডের একটা পদ। এছাড়া ছিল বিভিন্ন সামুদ্রিক খাবারের একটা মিশ্র পদ যার মধ্যে অক্টোপাসও ছিল। ডেজার্টে সুন্দর করে কাটা মিষ্টি তরমুজ ও মাস্ক মেলন। আমরা সবই অল্প অল্প করে খেলাম। প্রত্যেকটি পদ বেশ সুস্বাদু। তবে অক্টোপাসটা খেতে মন সায় দিল না।

লাঞ্চের পর দু-একটা স্যুভেনির শপে ঘোরা ঘুরি করে সবে ছাতার তলায় বসেছি দেখি কী অবাক কাণ্ড - এক প্রৌঢ় ভিয়েতনামী কাপল স্যুইম স্যুট ছেড়ে হঠাৎ তাদের ওয়েডিং ড্রেস পরে ফেললেন। ওঁদের সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন, তিনি একের পর এক ছবি তুলতে শুরু করলেন। প্রথমে তো বুঝেই

উঠতে পারছিলাম না যে এবার কী হচ্ছে - সিনেমার শুটিং না আবার মডেলিং! একে ওকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঐ প্রৌঢ় দম্পতি তৃতীয় বার বিবাহ করেছেন দিন সাতেক আগে। বর্তমানে পাটায়ায় এসেছেন মধুচন্দ্রিমা সারতে। নিরালা এই দ্বীপে তাঁদের মধুচন্দ্রিমাকে স্মরণীয় করে তুলতে সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এসেছেন। তিনি ক্যামেরা বন্দী করতে লাগলেন দুজনের কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে নির্জন দ্বীপের প্রেক্ষাপটে। ততক্ষণে অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে ওঁদের অভিনন্দন জানিয়ে ছবি তুলতে শুরু করেছেন। আমরাও বা বাকী থাকি কেন? তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনব এই মধুচন্দ্রিমার কিছু মিষ্টি মধুর মুহূর্তের ছবি তুলে ফেললাম।

কখন দুপুর তিনটে বেজে গিয়েছিল কারোর খেয়াল ছিল না । হুইসেলের আওয়াজে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। তাই তো - ফেরিতে ওঠার কথা তিনটের সময়। প্রথমে হাঁটু জল পেরিয়ে আবার সেই ছোট বোটে, তারপর গভীর জলে গিয়ে নির্দিষ্ট ফেরিতে ওঠা। ফেরিতে বসে সবারই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব - দীর্ঘক্ষণ জলে মাতামাতি করার ক্লান্তি আর পেট ভরা খাবার। আস্তে আস্তে কো-লার্ন দ্বীপ চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। অতল সমুদ্রের জল কেটে কেটে ফেরিটি এগোতে লাগল। হঠাৎ থেমে যাওয়ায় চোখ খুলে দেখি সেই উৎসাহী দলটি যারা প্যারাসেলিং ও অন্যান্য প্যাকেজ নিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। ওরা ওখানেই লাঞ্চ সেরে অন্য একটা দ্বীপ ঘুরে অপেক্ষা করছিল। সূর্যাস্তের একটু আগেই পাটায়ার সৈকতে ফিরে এলাম।

[থাইল্যাণ্ডের তথ্য]

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর করে বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন। ভালবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ও জীবনানন্দের কবিতা পড়তে। সময় সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দেশে-বিদেশে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলায়

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কম বয়সে শুনতাম বাঙালির হাওয়া বদলের একটা সেরা জায়গা নাকি ঘাটশিলা। একটু বড় হয়ে তখন পথের পাঁচালি, চাঁদের পাহাড়, আরণ্যক পড়ে ফেলেছি। জেনেছিলাম ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন। রেলের চাকরিতে বত্রিশ বছর মধ্যপ্রদেশ বা এখনকার ছত্তিশগড়ে কাটিয়েছি। কতবার যে ছোট্ট ঘাটশিলা স্টেশন পেরিয়ে হুহু করে বোম্বে মেলে ছুটেছি! কিন্তু সে তো গভীর রাত্রে। যখন বোম্বাই এক্সপ্রেসে বাড়ি আসতাম, দিনের বেলায় পেরোতাম ঘাটশিলা। তখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স, ঘরে ফেরার আনন্দ! ট্রেনের কামরার জানলা দিয়ে গাছপালা ঘেরা ছোট্ট ঘাটশিলা স্টেশনের টিকিট ঘরটা দেখতাম আর মনে মনে কল্পনা করে নিতাম, ওই আশে পাশে কোথাওবা হবে অপু-দুর্গার সৃষ্টিকর্তার বাড়িটা। সে অনেক দিন আগেকার কথা। পঞ্চাশ বছর আগের।

নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতায় ঘাটশিলা এসেছিল এইভাবে - (দুটি স্তবক দিলাম)

"ঘাটশিলা–ঘটশিলা–
কলকাতা ছেড়ে বল ঘাটশিলা কে যায় মিছাই
চিরদিন কলকাতা থাকি আমি, ঘাটশিলা ছাই। ...
একদিন তারপর–বহুদিন পরে
অনেক অসাধ অনিচ্ছায় ঘাটশিলা চলিলাম
ঘাটশিলা দেখিলাম হায় ..."

জীবনানন্দ অরণ্যঘেরা গাছ-গাছালির ঘাটশিলার স্মৃতির কোন লেখাজোখা রেখে গেছেন কীনা জানি না। তবে ভ্রমণ সাহিত্যের পথিকৃৎ প্রবোধ কুমার সান্যালকে ঘাটশিলায় টেনে আনতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। বলেছিলেন, 'ঘাটশিলায় চলে এসো। ওই ঢাকুরিয়াতে থাকলে স্বাস্থ্য টিকবে না'।

যাওয়া হয়নি এতোদিন। এবার গেলাম। হাওড়া থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার ট্রেন যাত্রা। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার বইয়ে পড়া জঙ্গল ঘেরা ঘাটশিলার সঙ্গে এখনকার ঘাটশিলাকে মেলাতে পারলাম না। না মেলাটাই স্বাভাবিক। নগরায়নের দস্তুর তো মানতেই হবে। বন কেটে বসত। ওভার ব্রিজ হয়েছে, ডিজেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে অটো, ট্রেকার ছুটছে। এক মাইল দূরে বিশ্বের দ্বিতীয় গভীরতম তামার খনি 'হিন্দুস্থান কপার' অনেকটা শহুরে সৌন্দর্য এনে দিয়েছে মাত্র ৩১০০ বর্গ কিলোমিটারের একদা ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ঘাটশিলার।

রাজা জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত আদিবাসীদের দেবতা গালুডির 'রিঙ্কিনী মন্দির' আর তার আশেপাশের জঙ্গল ঘেরা নিসর্গ-শোভা কিংবা যদুগোড়ায় পাহাড়ি ঝরনার জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা 'বুরুডি ড্যাম' ভ্রমণার্থীদের টানে বটে, কিন্তু আমার আকর্ষণ ছিল ছোট্ট ঘাটশিলার 'গৌরীকুঞ্জ'তে পা রাখা। এখানেই বিভূতিভূষণ থাকতেন। গৌরী তাঁর প্রথম স্ত্রী। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র এক বছরের। গৌরীর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। পুত্র তারাদাস তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। মাত্র একবছর দাম্পত্যজীবন কাটানো গৌরী দেবীর নামেই বিভূতিভূষণ তাঁর বাসার নামকরণ করেছিলেন 'গৌরীকুঞ্জ'। বাড়িটারও একটা কাহিনি আছে, বিভূতিভূষণ নিজে বাড়িটা বানান নি। 'ইছামতী'র সন্তান 'সুবর্ণরেখা'র কূলে পাকাপাকি ভাবে আস্তানা করবেন - এও কল্পনা করেন নি। কোন এক বন্ধু তাঁর কাছে কয়েকশ' টাকা ধার নিয়ে আর শোধ করতে পারেন নি। সে ভদ্রলোক শিক্ষাব্রতী ছিলেন। গালুডি ঘাটশিলা অঞ্চলের আরণ্যক শ্রীর প্রতি বিভূতির আকর্ষণ লক্ষ্য করে বন্ধুটি জোর করেই নিজের ঘাটশিলার বাড়িটি বিভূতিকে গছিয়ে নিজেকে আর্থিক ঋণ থেকে মুক্ত করেছিলেন। একজন বৃদ্ধ কেয়ারটেকার থাকেন বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য। তাঁর কাছেই বিভূতিভূষণের শেষ জীবনের দু'একটা কথাও শুনলাম। গৌরীকুঞ্জেই বিভূতিভূষণের মৃত্যু হয় ১লা নভেম্বর ১৯৫০-এ। গৌরীকুঞ্জে নেই কোন সংগ্রহশালা বা বিভূতিভূষণের ব্যবহৃত বস্তু বা লেখার সরঞ্জাম তবু এক অপরূপ তৃপ্তি আমার সঙ্গে থাকলো। যে মাটিতে, যে মাটির ঘাসে পথের পাঁচালি - অপরাজিত-আরণ্যকের স্রষ্টার পায়ের চিহ্ন আছে, যে বনানীর অমোঘ আমন্ত্রণে বনপথে হেঁটে বেড়াতেন, সেই মাটি আর ঘাস আমিও স্পর্শ করলাম, এটা কি কম পাওয়া !

'গৌরীকুঞ্জ'র কাছেই বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অনেকটা জায়গা নিয়ে রয়েছে 'বিভূতি স্মৃতি সংসদ'। এঁদের সঞ্চালক আক্ষেপ করলেন, 'আপনাদের ওখানেতো বিভূতিভূষণের স্মৃতি রক্ষার কোন আয়োজনই নেই'। সত্যি নেই বা আছে কিনা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু ঘাটশিলার কিছু মানুষের আন্তরিকতা রয়েছে এই সত্যিটা অন্তত জানা হ'ল ঘাটশিলা গিয়ে। স্মৃতি সংসদ কক্ষে এঁরা একটা ছোটদের ছবি আঁকার স্কুল চালান। গান, কবিতার অনুষ্ঠানও হয়। সামনের মাঠে বিভূতিভূষণের আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি। আর একটি কক্ষে তাঁর কয়েকটি ছবি ও কিছু কথা। এখানে একটা ছবি দেখলাম গৌরী কুঞ্জের উঠোনে শববাহী শয্যায় শায়িত কথাশিল্পী আর শয্যা স্পর্শ করে বসে আছেন শিশুপুত্র তারাদাস ও অন্যান্যরা। এই ছবিটা অন্যকোথাও আমি দেখিনি। লোকালয় থেকে বেশি দূরে নয়, কিন্তু আশেপাশের শান্ত পরিবেশ সময়কে কেড়ে নেয়। স্মৃতি সংসদের পরিচ্ছন্ন বারান্দায় বা সামনের মাঠে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় সব কাজ দূরে সরিয়ে রেখে। সময় দুর্বার গতিতে ধেয়ে চলেছে। এখনতো কোন অপু-দুর্গা কাশ বনের ফাঁক দিয়ে রেলগাড়ি ছোটা দেখে না। তবুও মানুষ - কিছু মানুষ কোনোনা কোনো ভাবে অতীতকে ধরে রাখতে চায়, ধরে রাখে। বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা অন্তত তাঁকে ভুলে যায় নি।

তরুণ বয়সে ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' সিনেমাটা দেখেছিলাম। সেই প্রথম 'সুবর্ণরেখা' নামটা শুনেছিলাম। আর এখানে চাক্ষুষ দেখলাম 'সুবর্ণরেখা' আর তার জলধারা। লোকপ্রবাদ, এ নদীর ঘাটে নাকি সোনা মেলে তাই এই নাম। আর সুবর্ণরেখার ঘাটে শিলা তাই নাম ঘাটশিলা। লোককথা তার জায়গায় থাকুক। কিন্তু সত্য যেটা দেখার, তা হ'ল ছোট বড় অজস্র উপলখণ্ডের বাধা পেরিয়ে বয়ে চলেছে রাঁচির কাছে 'নাগিরি' থেকে উৎপন্ন পূর্ব সিংভুম জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর,বালাসোর,তালসারি ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাওয়া ৩৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জলধারা। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র প্রবহমান ভাগিরথীর তীরে দাঁড়িয়ে নিজের কাছেই যেন জানতে চেয়েছিলেন 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো ?' ঘাটশিলায় সুবর্ণরেখার প্রশস্ত ঘাট এড়িয়ে উপলখণ্ডে বসে সুবর্ণরেখার ধারা স্পর্শ করার কিংবা তাকে ছুঁয়ে দুদণ্ড বসে থাকার যে কাব্যিক অনুভূতি তাকে প্রকাশ করি কেমন করে?

ঘাটশিলা গালুডির আশেপাশে জঙ্গলে সকালে হেঁটে বেড়ালে অরণ্য যে কীভাবে অনুভূতির তন্ত্রী স্পর্শ করে আত্মমগ্ন করে দেয় তার হদিস কে দেবে! নিজেকেই বলতে ইচ্ছে হয় 'ঐ সন্ধ্যা-তারার মত রহস্যের মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও বনকাকলির মধ্যে আমায় তোমার খেলার সঙ্গী করে রেখো যুগ যুগ । তুমি আপন মনে বিশ্বের বনতলে নবীন কিশোর সেজে বনফুলের মালা গলায় উদাসী হয়ে বেড়াও। সবাই ধন, জন, মান, যশ নিয়ে ব্যস্ত। কে দেখছে এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশার অপূর্ব মন-মাতানো শোভা? আমার দেখার চোখ দিও জন্মে জন্মে। বারবার আসতে যেতে কোন আপত্তি নেই আমার - তবে তুমি মহাশিল্পী, তোমার প্রসাদ যেন জন্ম জন্ম লাভ করি - এই চোখ নিয়ে যেন দেখে যাই"। এ বর্ণনা আমার নয় । শখের জঙ্গল দেখা শহুরে আমি এ ভাষা পাবো কোথায়! অরণ্যশিল্পী বিভূতিভূষণ একাত্তর বছর আগে তার দিনলিপিতে লিখে গেছেন তাঁর অনুভূতি। দিনলিপির তারিখ ১৭ই মে ১৯৪৩ [গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য'র 'অপুর পাঁচালী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে অনেক কিছু এই সত্তর বছরে। অরণ্যের অধিকার বেহাত হয়ে চলেছে, মাটিতে কোদাল-গাঁইতির শব্দ, তামা আর ইউরেনিয়াম খনির বর্জ্য বুকে ধারণ করছে সুবর্ণরেখা। তবু এখনও লোকালয় পেরিয়ে অরণ্যের অমোঘ আমন্ত্রণ। লোকালয় পেরিয়ে শাল-মহুয়ার জঙ্গল, গালুডির সবুজ নির্জনতা, ফুলডুংরি টিলা থেকে সূর্যাস্ত দেখা, শাল-মহুয়া-আমলকির জঙ্গল পেরিয়ে আদিবাসী জনজীবন আর লালমাটির সোঁদা গন্ধতো তেমনই আছে। তাইতো আজও প্রকৃতি এই অনিন্দ্য আয়োজন বারে বারে ডাক পাঠায় আর নির্জনতা প্রেমী জীবনানন্দের কবিতার পংক্তির মত ভ্রমণ-পিয়াসী মন বলে ওঠে -

"অনেক অসাধ অনিচ্ছায় ঘাটশিলা চলিলাম
ঘাটশিলা দেখিলাম হায় ..."

~ ঘাটশিলার তথ্য ~ ঘাটশিলার আরো ছবি ~

প্রবীণ সাহিত্য কর্মী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ও সমাজ ভাবনার নানান বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক লেখেন। রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ছত্তিশগড়ে। এখন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। 'অন্যনিষাদ' ও 'গল্পগুচ্ছ' নামে দুটি ওয়েব পত্রিকা সম্পাদনা করেন। "আমাদের ছুটি" পত্রিকাতেই তাঁর ভ্রমণ লেখার হাতেখড়ি।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

বর্ষায় গড়পঞ্চকোটে

মানস ভট্টাচার্য

ভরা বর্ষাকাল, এই সময় হাতে দুদিনের ছুটি - কোথায় যাব ? ঠিক হল গড়পঞ্চকোট যাত্রা। বনবিভাগের বাংলোর বুকিং পেয়ে গেলাম সহজেই। সপরিবারে তিন বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসানসোল। সেখান থেকে গাড়িতে কিছুক্ষণ ভুলপথে চক্কর কেটে অবশেষে পৌঁছলাম গড়পঞ্চকোট প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র ও পর্যটকাবাস।

অগ্নিশিখা ফুলের উপর আগুন রঙের প্রজাপতির ছটফটানি স্বাগত জানাল আমাদের। পঞ্চকোট পাহাড়ের ঠিক নিচে ফরেস্ট বাংলোটির অবস্থান অনবদ্য। রক্ষণাবেক্ষণ আরও কিছুটা ভালো হলে পরিষেবার মানও আরও উন্নত হত।

দ্বিপ্রাহারিক আহারের পর ক্ষণিকের বিশ্রাম আমাদের পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। বনবাংলোর রান্নাটা বেশ ভালো। তবে সাধারণ বাঙালি খাবার।

বিকেলে বেরোলাম পাঞ্চেত বাঁধ ও তৎসংলগ্ন দামোদর পার্কের উদ্দেশে। বাঁধের জলে সূর্যাস্ত হল। চরাচর যেন প্রকৃতির সঙ্গে গোধূলি লগ্নে হোলি খেলায় মেতে উঠল। কত রকম রঙে মন রাঙাল - অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাঁধের রাস্তার দুপাশের সবুজ মাঠে সাদা কাশফুলের ঝাড় - দূর থেকে দেখে বরফের আস্তরণ বলে ভ্রম হয়। অনেকটা যেন কোন বিদেশি উপত্যকার পটচিত্র। সূর্য ডুবে গেল দামোদর পার্কে যেতে যেতে। ছিমছাম সুন্দর জায়গাটা সাঁঝের আঁধারে ভালো করে দেখা হল না। ঠিক করলাম আবার আসব।

পরের দিন স্থানীয় গাইড স্বপন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। এখানকার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাবেন - ট্রিপপিছু ১৫০ টাকা গাইড চার্জ এই হিসেবে। প্রথমেই গেলাম গড়পঞ্চকোটের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। স্বপনবাবুর মুখে সেই যুগের ইতিহাস শুনতে শুনতে যেন পৌঁছে যাচ্ছিলাম সেই সাড়ে পাঁচশো বছর অতীতে। পঞ্চকোট পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে খননের ফলে টেরাকোটা, জোড়বাংলা,পাঁচ চূড়োর ৯ টি মন্দির, গোপন কুঠুরি, সুড়ঙ্গ এমন সবের প্রাচীন অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। অতীত অজানা হলেও ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর রাজবংশের দখলে যায় পঞ্চকোট গড়। পরে জঙ্গলমহলের অংশ হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭২ সালে কিছুদিনের জন্য এই এষ্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন। এখন সবই অনাদরে পরে আছে।

ইতিহাসের প্রতি আমাদের এই ঔদাসীন্যর কথা ভাবতে ভাবতে চলে এলাম বিরিঞ্চিবাবা পাতাল ভৈরব মন্দিরে। ছোট্ট ঝরনা ছিল মন্দিরের পিছনে। সেখান থেকে পৌঁছলাম মুরাডি লেকে। ছোট ছোট টিলা পাহাড়ে ঘেরা সেই প্রাকৃতিক হ্রদের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ। এই লেকের জল সেচের কাজে ও পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুনলাম এখানে সূর্যাস্ত মনোমুগ্ধকর...কিন্তু সময়াভাবে দেখা হল না।

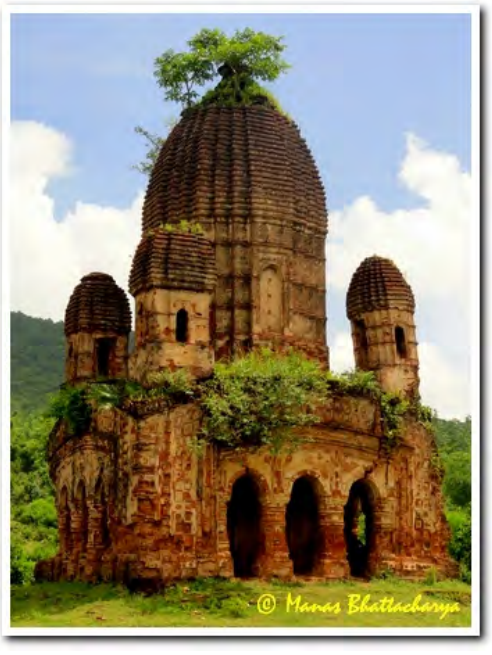

বিকেলের দিকে গেলাম ২৬ কিমি দূরে রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহড়ে। এখানেই মাননীয় সত্যজিৎ রায় মহাশয় 'হীরক রাজার দেশে'র শুটিং করেছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত ছোট একটি মঞ্চ সেই স্মৃতি বহন করছে। ৫০২ সিঁড়ি ভেঙ্গে পৌছালাম জয়চন্ডী মাতার মন্দিরে। এই পাহাড়টি পঞ্চকোট পাহাড়ের মত সবুজ নয় -- পাথুরে, রুক্ষ। কিন্তু পাহাড়চূড়া থেকে চারপাশের যে চোখজুড়ানো সবুজ দৃশ্য দেখতে পেলাম তা এককথায় অনবদ্য। জয়চন্ডী পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে দেখা এক অসামান্য সূর্যাস্ত যা ভুলিয়ে দিল এতগুলো সিঁড়ি উঠবার ক্লান্তি। মন্দিরে পুজো দিয়ে চাতালে বসে সেই অপরূপ রূপ অন্বেষণ করলাম কিছুক্ষণ, অন্ধকার নেমে এলে মন না চাইলেও সেই পাথুরে সৌন্দর্য্য ছেড়ে নীচে নেমে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা বনবাংলোর বারান্দা থেকে দূরে শিল্পাঞ্চলের আলোগুলি সিমলা মুসৌরীর মত না হলেও যথেষ্ট উদ্দীপক।

শেষদিন সকালে গেলাম পঞ্চকোট পাহাড়ের ওপরে। ৭.৫ কিমি গাড়ি যায়, তবে বর্ষার সময় বলে মাত্র ৩.৫ কিমি যাচ্ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে উঠলাম আরও কিছুটা। পথে দেখলাম অনেক ওষধি গাছ, রংবেরঙের প্রজাপতি আর পতঙ্গের মেলা। হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার শেষবারের মতো পাঞ্চেত বাঁধ ও দামোদর পার্কে। নানান ফুল, প্রজাপতির রঙে রঙিন সেই পার্কে বর্ষায় মনে হচ্ছে যেন সবুজ গালিচা পাতা। তবে সাপের ভয় আছে। চোখে পড়ল সাপ পাখির বাচ্চা ধরে খাচ্ছে। বাঁধ পরবর্তী দামোদর নদের অংশটুকু ভরা বর্ষায় খরস্রোতা, ভয়ংকর সুন্দর। রুক্ষ পাথরে জলস্ফীত গতিশীল নদের আস্ফালন দেখতে দেখতে কখন যেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল টের পেলাম না। ছোট নৌকায় চড়ে নদী ঘোরা আর হল না। আবার আসব বলে মনস্থির করে ফিরে চললাম।

~ গড়পঞ্চকোটের তথ্য ~ গড়পঞ্চকোটের আরো ছবি ~

পেশায় চিকিৎসক মানস ভট্টাচার্য ভালোবাসেন বার্ড ওয়াচিং, বেড়াতে, গান শুনতে আর পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher